পাতঞ্জল যোগসূত্র

স্বামী বিবেকানন্দ

পাতঞ্জল যোগসূত্র

স্বামী বিবেকানন্দ

সারস্বত প্রকাশন

২০২২

প্রকাশকের নিবেদন

হিন্দু দর্শনের ছটি শাখা রয়েছে। এদের একত্রে বলে ষড়দর্শন। শাখাগুলি হল - মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। বেদান্তের আবার সাতটি উপশাখা রয়েছে। সেগুলি হল অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ এবং অক্ষরপুরুষোত্তম। এই সমস্ত শাখাগুলির মিল হচ্ছে এরা প্রত্যেকেই বেদকে মান্যতা দেয়। তাই এদের স্বতন্ত্র বক্তব্য থাকা সত্বেও এগুলি সবই হিন্দু দর্শনের অন্তর্গত। ভারতীয় দর্শনের যে শাখাগুলি বেদকে মান্যতা দেয় না সেগুলি হল বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন।

ষড়দর্শনের মধ্যে যোগ ও সাংখ্য এই দুটি দর্শন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অত্যন্ত প্রাচীন একটি দর্শন হল সাংখ্য। সাংখ্য দর্শনের উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। ভগবদ্‌গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাংখ্যের জ্ঞান প্রদান করেছেন। সাংখ্যের প্রবক্তা হচ্ছেন মহর্ষি কপিল। মজার ব্যাপার হল যে, সাংখ্য একটি নিরীশ্বরবাদী দর্শন। স্পষ্টভাষায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু যোগদর্শনে সাংখ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরী হলেও এতে ঈশ্বরকে

যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা যে যোগাসন করি তা এই যোগ শাখারই প্রক্রিয়া।

প্রতিটি হিন্দু দর্শনের শাখার একটি করে সূত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলিতে সেই দর্শনের বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিছু সূত্রের মাধ্যমে গুছিয়ে বলা আছে। ব্যাখ্যা ছাড়া এই সূত্রগ্রন্থগুলি বোঝা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি সূত্রগ্রন্থের টীকা রয়েছে। যোগদর্শনের সূত্রগ্রন্থটির রচয়িতা হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। পাতঞ্জল যোগসূত্রের টীকাকার হলেন ব্যাস। আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দ এই যোগসূত্রের বঙ্গানুবাদ এবং টীকা লিখেছিলেন। সেটিই এখানে মূদ্রিত হল।

—

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

যোগসূত্র-ব্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পূর্বে, যোগীদের সমগ্র ধর্মমত যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, আমি সেই বিরাট প্রশ্নটির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ সকলেই এ-বিষয়ে একমত বলিয়া বোধ হয়, আর জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা আমাদের বর্তমান সবিশেষ ভাবের পশ্চাতে অবস্থিত এক নির্বিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও ব্যক্তভাবস্বরূপ; আবার সেই নির্বিশেষভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। যদি এইটুকু স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন এই—উক্ত নির্বিশেষ অবস্থা উচ্চতর, না বর্তমান অবস্থা? এমন লোকের অভাব নাই, যিনি মনে করেন এই ব্যক্ত অবস্থাই মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা। অনেক শক্তিমান্ মনীষীর মত—আমরা এক নির্বিশেষ সত্তার ব্যক্তভাব, এবং নির্বিশেষ অবস্থা অপেক্ষা এই সবিশেষ অবস্থা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা মনে করেন, নির্বিশেষ সত্তার কোন গুণ থাকিতে পারে না, সুতরাং উহা নিশ্চয়ই অচৈতন্য, জড় ও প্রাণশূন্য। তাঁহারা আরও মনে করেন, এই জীবনেই কেবল সুখভোগ সম্ভব, সুতরাং ইহাতেই আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত। প্রথমেই আমরা অনুসন্ধান করিতে

চাই, জীবন-সমস্যার আর কি কি সমাধান আছে? এ সম্বন্ধে এক অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ পূর্বের মতই থাকে, তবে তাহার অশুভগুলি থাকে না, কেবল যেগুলি ভাল, সেগুলি সবই চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়। যুক্তি বা ন্যায়ের ভাষায় এই সত্যটি স্থাপন করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, মানুষের লক্ষ্য এই জগৎ। এই জগতেরই কিছু উচ্চাবস্থা এবং ইহার মন্দ অংশ বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকেই স্বর্গ বলে। এই মতটি যে অসম্ভব ও বালজনোচিত তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়; কারণ এরূপ হইতে পারে না। ভাল নাই অথচ মন্দ আছে, বা মন্দ নাই অথচ ভাল আছে—এরূপ হইতেই পারে না। কিছু মন্দ নাই, সব ভাল—এরূপ জগতে বাস করার কল্পনাকে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ 'আকাশ-কুসুম' বলিয়া বর্ণনা করেন। আধুনিককালে আর একটি মত অনেক সম্প্রদায় কর্তৃক উপস্থাপিত হয়, তাহা এই—মানুষ ক্রমাগত উন্নতি করিবে, চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখনও সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে না, ইহাই মানুষের নিয়তি। এই মতও আপাততঃ অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হইলেও অসম্ভব, কারণ সরল রেখার কোন গতি হইতে পারে না। সমুদয় গতিই বৃত্তাকারে হইয়া থাকে। যদি তুমি একটি প্রস্তর আকাশে নিক্ষেপ কর, তারপর যদি তুমি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাক ও প্রস্তরটি কোন বাধা না পায়, তবে উহা ঠিক তোমার হাতে ফিরিয়া আসিবে। একটি সরল রেখাকে অসীমভাবে বর্ধিত করা হইলে উহা একটি বৃত্তরূপে

পরিণত হইয়া শেষ হইবে। অতএব মানুষ ক্রমাগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, কখনও থামে না—এইরূপ মত অসম্ভব। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি মন্তব্য করিতে পারি, 'কাহাকেও ঘৃণা করিও না, সকলকে ভালবাসিও'—নীতিশাস্ত্রের এই মতবাদটি পূর্বোক্ত মতদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। যেমন তড়িৎ সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, ঐ শক্তি বিদ্যুদাধার-যন্ত্র (dynamo) হইতে বহির্গত হইয়া আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবৃত্ত হয়—ঘৃণা ও ভালবাসা ঠিক সেইরূপ। সমুদয় শক্তিই আবার উৎসমুখে ফিরিয়া আসিবে। অতএব কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কারণ যে ঘৃণা তোমা হইতে বহির্গত হয়, তাহা কালে তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে। যদি তুমি ভালবাসো, তবে সেই ভালবাসাও তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। ইহা অতি নিশ্চিত যে, মানুষের অন্তঃকরণ হইতে যে ঘৃণা বহির্গত হয়, তাহার অণুপরমাণু ফিরিয়া আসিয়া তাহার উপর পূর্ণ বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিবে। কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। একইভাবে ভালবাসার প্রতিটি স্পন্দনও ফিরিয়া আসিবে।

'অনন্ত উন্নতি'-সম্বন্ধীয় মত যে স্থাপন করা অসম্ভব, তাহা আরও অন্যান্য প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনেক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে—বিনাশই পার্থিব সকল বস্তুর চরম গতি, অতএব অনন্ত উন্নতির মতটি কোনমতেই টিকিতে পারে না। আমাদের নানাপ্রকার চেষ্টা, আমাদের এই-সব

আশা, এত ভয়, এত সুখ—এ-সবের পরিণাম কি? মৃত্যুই আমাদের সকলের চরম পরিণাম। ইহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত আর কিছুই নাই। তবে এই সরল রেখায় গতির কি হইল? অনন্ত উন্নতির কি হইল?—কিছুদূর যাওয়া, আবার যেখানে হইতে গতি আরম্ভ হইয়াছিল, সেই স্থানে ফিরিয়া আসা। দেখ—নীহারিকা (nebulae) হইতে সূর্য, চন্দ্র, তারা উৎপন্ন হইতেছে, পরে নীহারিকাতেই ফিরিয়া আসিতেছে। সর্বত্রই এইরূপ চলিতেছে। উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছে, আবার যখন সংগঠন ভাঙিয়া যায়, তখন মাটিতেই সব ফিরাইয়া দিতেছে। যাহা কিছু আকার পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাই পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার সেই পরমাণুতেই ফিরিয়া যাইতেছে।

একই নিয়ম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে কার্য করিবে, তাহা হইতে পারে না। নিয়ম সর্বত্রই একরূপ। ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই নাই। ইহা যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহা হইলে অন্তর্জগতেও এ নিয়ম খাটিবে। চিন্তা ইহার উৎপত্তি-স্থানে গিয়া লয় পাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমাদিগকে আমাদের সেই আদিতে —পরমসত্তা ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, আমাদিগকে পুনরায় ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাঁহাকে যে নামেই ডাক না কেন—তাঁহাকে 'গড' বা ঈশ্বর বল, নির্বিশেষ বা পরম সত্তা বল, আর প্রকৃতিই বল, উহা সেই একই বস্তু। 'যাঁহা হইতে এই বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে সমুদয়

প্রাণী অবস্থান করিতেছে ও যাঁহাতে আবার সব কিছু ফিরিয়া যাইবে।' ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে না। প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে কার্য করিয়া থাকে। এক স্তরে যে কার্য হইতেছে, অন্য লক্ষ লক্ষ স্তরেও তাহাই পুনরাবর্তিত হয়। গ্রহসমূহে যাহা দেখিতে পাও, এই পৃথিবীতে—সকল মনুষ্যে ও সর্বত্র সেই একই ব্যাপার চলিতেছে। বৃহৎ তরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু তরঙ্গের এক মহাসমষ্টি মাত্র। জগতের জীবন বলিতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবনের সমষ্টিমাত্র বুঝায়। আর জগতের মৃত্যু বলিতে এই-সকল লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবের মৃত্যুই বুঝায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে—এই ভগবানে প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা কিনা? যোগমতাবলম্বী দার্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন, 'হাঁ, উহা উচ্চাবস্থা।' তাঁহারা বলেন, 'মানুষের বর্তমান অবস্থা একটি অধঃপতিত অবস্থা।' জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহা বলে—মানুষ পূর্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। ভাবটি এই যে, আদিতে মানুষ শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, পরে ক্রমাগত অবনত হইতে থাকে, এতদূর নীচে যায়, যাহার নীচে সে আর যাইতে পারে না। পরে এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন সে সবেগে আবার উপরে উঠিতে থাকিবে এবং বৃত্ত-গতি সম্পূর্ণ করিয়া পূর্ব স্থানে উপনীত হইবে। বৃত্তাকারে গতি পূর্ণ করিতেই হইবে। মানুষ যত নীচেই নামিয়া যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহাকে উর্ধ্বগতি লাভ করিয়া আদি কারণ ভগবানে ফিরিয়া

যাইতে হইবে। মানুষ প্রথমে ভগবান্ হইতে আসে, মধ্যে সে মনুষ্যরূপ লাভ করে, পরিশেষে পুনরায় ভগবানে প্রত্যাবর্তন করে। দ্বৈতবাদের ভাষায় তত্ত্বটি এইভাবেই বলা হয়। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়ঃ মানুষই ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মভাবে ফিরিয়া যায়। যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত ভয়াবহ ব্যাপার সকল রহিয়াছে কেন? আর ইহার অন্তই বা হয় কেন? যদি এইটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তবে ইহার শেষ হয় কেন? যেটি বিকৃত ও অবনত হয়, সেটি কখনও সর্বোচ্চ অবস্থা হইতে পারে না। এই জগৎ এত পৈশাচিক-ভাবাপন্ন—এত অতৃপ্তিকর কেন? এই-বিষয়ে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, ইহার মধ্য দিয়া আমরা একটি উচ্চতর পথে উঠিতেছি। নবজীবন লাভ করিবার জন্যই এই অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া দাও, উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া কিছুকাল পরে একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে, আবার সেই বিশ্লিষ্ট অবস্থা হইতে এক মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে হইলে প্রত্যেক জীবাত্মাকেই ঐ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যত শীঘ্র এই 'মানব'-সংজ্ঞক অবস্থাবিশেষকে অতিক্রম করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। তবে কি আত্মহত্যা করিয়া আমরা এ অবস্থা অতিক্রম করিব? কখনই নয়। উহাতে বরং আরও অনিষ্ট হইবে। শরীরকে অনর্থক

পীড়া দেওয়া, অথবা জগৎকে গালাগালি দেওয়া, ইহার বাহিরে যাওয়ার উপায় নয়। আমাদিগকে নৈরাশ্যের পঙ্কিল হ্রদের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে; আর যত শীঘ্র ইহা অতিক্রম করিতে পারি—ততই মঙ্গল। কিন্তু এটি যেন সর্বদা স্মরণ থাকে যে, আমাদের এই মনুষ্য-অবস্থা সর্বোচ্চ অবস্থা নয়।

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝা বাস্তবিক কঠিন যে, নির্বিশেষ অবস্থাকে সর্বোচ্চ অবস্থা বলা হয়, তাহা অনেকে যেরূপ আশঙ্কা করেন—প্রস্তর বা স্পঞ্জ প্রভৃতির অবস্থার মত নয়। তাঁহাদের মতে জগতে মাত্র দুই প্রকার অস্তিত্ব আছে—এক প্রকার প্রস্তরাদির ন্যায় জড় ও অপর প্রকার চিন্তাবিশিষ্ট। অস্তিত্বকে এই দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ করিবার কি অধিকার তাঁহাদের আছে? চিন্তা হইতে অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট অবস্থা কি নাই? আলোকের কম্পন অতি মৃদু হইলে আমরা দেখিতে পাই না, যখন ঐ কম্পন অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়—তখনই আমাদের চক্ষে উহা আলোকরূপে প্রতিভাত হয়। যখন আরও তীব্র হয়, তখনও আমরা উহা দেখিতে পাই না, উহা আমাদের চক্ষে অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই শেষোক্ত অন্ধকার কি ঐ প্রথমোক্ত অন্ধকারেরই মত? নিশ্চয়ই নয়। উহারা দুই মেরুপ্রান্তের ন্যায় ভিন্ন। প্রস্তরের চিন্তাশূন্যতা ও ভগবানের চিন্তাশূন্যতা কি একই প্রকারের? কখনই নয়। ভগবান্ চিন্তা করেন না; বিচার করেন না। কেন করিবেন? তাঁহার নিকট কি কিছু অজ্ঞাত আছে যে, তিনি বিচার করিবেন? প্রস্তর বিচার করিতে

পারে না, আর ঈশ্বর বিচার করেন না—এই পার্থক্য। পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা মনে করেন যে, চিন্তার বাহিরে যাওয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার, তাঁহারা চিন্তার অতীত কিছু খুঁজিয়া পান না।

যুক্তিবিচারকে অতিক্রম করিয়া অনেক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে। বাস্তবিক, বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই আমাদের প্রথম ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। যখন তুমি চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি—সমুদয় অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, তখনই তুমি ভগবৎ-প্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে। ইহাই জীবনের প্রকৃত আরম্ভ। যাহাকে সাধারণতঃ জীবন বলা হয়, তাহা প্রকৃত জীবনের ভ্রূণাবস্থা মাত্র।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিন্তা ও বিচারের অতীত অবস্থাটি যে সর্বোচ্চ অবস্থা, তাহার প্রমাণ কি? প্রথমতঃ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ—যাহারা কেবল বাক্য-ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তিগণ—নিজ শক্তিবলে যাঁহারা সমগ্র জগৎকে পরিচালিত করিয়াছেন, যাঁহাদের চিন্তায় স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না, তাঁহারা সকলেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, এই জীবন সেই অনন্তস্বরূপে পৌঁছিবার পথে একটি ছোট সোপান মাত্র। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা কেবল এইরূপ বলেন তাহা নয়, পরন্তু তাঁহারা সকলকেই সেই পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাদের সাধন-প্রণালী বুঝাইয়া দেন, যাহাতে সকলেই তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। তৃতীয়তঃ আর কোন পথ নাই। জীবনের আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা

দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা চিরকাল এই চক্রের ভিতর ঘুরিতেছি কেন? কোন্ যুক্তি দ্বারা এই জগতের ব্যাখ্যা করা যায়? যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক দূরে যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা করিবার না থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা হইয়া থাকিবে। ইহাকেই অজ্ঞেয়বাদ বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে, এমন কী যুক্তি আছে? আমি তাঁহাকেই যথার্থ অজ্ঞেয়বাদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মরিতে পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের সর্বস্ব হয়, তবে শূন্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমরা কোথাও দাঁড়াইতে পারি না। কেবল অর্থ, যশ, নামের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অপর সব বিষয়ে যদি কেহ নাস্তিক হয়, তবে সে একটি জুয়াচোর মাত্র। ক্যাণ্ট (Kant) নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা যুক্তিরূপ বিরাট পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রথম কথাঃ আমরা যুক্তিকে অতিক্রম করিতে পারি। যোগীরা অতি সাহসের সহিত অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং এমন এক বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন, যাহা যুক্তির ঊর্ধ্বে, সেখানেই আমাদের বর্তমান অবস্থার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যাহা আমাদিগকে জগতের বাহিরে লইয়া যায়, এমন বিষয় শিক্ষা করিবার ইহাই ফল। 'তুমি আমাদের

পিতা, তুমি আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়া যাইবে।' ইহাই ধর্মবিজ্ঞান, অন্য কিছু নয়।

—

সমাধিপাদ

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১॥

এখন যোগ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২॥

চিত্তকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার বা পরিণাম গ্রহণ করিতে না দেওয়াই যোগ।

এখানে অনেক কথা বুঝাইতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, চিত্ত কি ও বৃত্তিগুলিই বা কি। আমার এই চক্ষু আছে। চক্ষু বাস্তবিক দেখে না। মস্তিষ্কে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রটি—দর্শনেন্দ্রিয়—অপসৃত কর, তখন তোমার চক্ষু থাকিতে পারে, চক্ষের অক্ষিজাল অক্ষত থাকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে-ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাহাও পড়িতে পারে, তথাপি চক্ষু দেখিতে পাইবে না। চক্ষু কেবল দর্শনের গৌণ যন্ত্রমাত্র। উহা প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় নয়। দর্শনেন্দ্রিয় মস্তিষ্কের অন্তর্গত একটি স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত। কেবল চক্ষু-দুইটিই যথেষ্ট নয়। কখনও কখনও লোকে

চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা যায়। আলো (এবং দর্শনেন্দ্রিয়) রহিয়াছে, বাহিরে চিত্র রহিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় একটি বস্তুর প্রয়োজন, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হওয়া চাই। সুতরাং দর্শনক্রিয়ার জন্য চক্ষুরূপ বহির্যন্ত্র, মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্র ও মন—এই তিনটি জিনিসের আবশ্যক। রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাইতেছ না। ইহার কারণ কি? কারণ তোমার মন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় নাই। অতএব প্রত্যেক অনুভবক্রিয়ার জন্য চাই—প্রথমতঃ বাহিরের যন্ত্র, তারপর ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়তঃ উভয়েতে মনের যোগ। বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাকে মন আরও অভ্যন্তরে বহন করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি হইতে প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়ার সহিত অহংভাব জাগিয়া উঠে। আর এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, পুরুষের (বা প্রকৃত আত্মার) নিকট অর্পিত হয়। তিনি তখন এই মিশ্রণটিকে একটি বস্তুরূপে উপলব্ধি করেন। ইন্দ্রিয়গণ, মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহংকার মিলিত হইয়া যাহা হয়, তাহাকে 'অন্তঃকরণ' বলে। উহারা মনের উপাদান—চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াস্বরূপ। চিত্তের অন্তর্গত এই-সকল চিন্তাতরঙ্গকে বৃত্তি (আক্ষরিকভাবে আবর্ত বা ঘূর্ণি) বলে। এখন জিজ্ঞাস্য—চিন্তা কি? ম্যাধ্যাকর্ষণ বা বিকর্ষণ-শক্তির ন্যায় চিন্তাও একপ্রকার শক্তি। প্রাকৃতিক শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে চিত্ত-নামক যন্ত্রটি কিছু শক্তি সংগ্রহ করিয়া অঙ্গীভূত করে এবং চিন্তারূপে প্রেরণ করে। খাদ্য হইতে আমাদের এই

শক্তি সংগৃহীত হয়। ঐ খাদ্য হইতেই শরীর গতিশক্তি প্রভৃতি লাভ করে। অন্যান্য সূক্ষ্মতর শক্তিও খাদ্য হইতেই চিন্তারূপে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন চৈতন্যময় নয়, অথচ চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ হইবার কারণ কি? কারণ চৈতন্যময় আত্মা উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন। তুমিই একমাত্র চৈতন্যময় পুরুষ—মন কেবল একটি যন্ত্র, ইহাদ্বারা তুমি বহির্জগৎ অনুভব কর। এই পুস্তকখানির কথা ধর, বাহিরে উহার পুস্তকরূপ কোন অস্তিত্ব নাই। বাহিরে যাহা আছে, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; উহা কেবল উত্তেজক কারণ মাত্র। উহা মনে আঘাত করে, মনও পুস্তকরূপে প্রতিক্রিয়া করে। তেমনি জলে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে জলও তরঙ্গাকারে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে প্রতিঘাত করে; সুতরাং বাস্তব বহির্জগৎ মানসিক প্রতিক্রিয়ার উত্তেজক কারণ মাত্র। পুস্তকাকার, গজাকার বা মনুষ্যাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই; বাহিরের ইঙ্গিত বা উত্তেজক কারণ হইতে মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, কেবলমাত্র তাহাই আমরা জানিতে পারি। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, ‘ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিত্য সম্ভাব্যতার নাম জড়পদার্থ। বাহিরে ঐ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি শুক্তি লওয়া যাক। তোমরা জান, মুক্তা কিরূপে উৎপন্ন হয়। এক বিন্দু বালুকণা, কীটাণু বা আর কিছু উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে; তখন সেই শুক্তি ঐ বালুকার চতুর্দিকে এক প্রকার এনামেল-তুল্য আবরণ দিতে থাকে;

তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। অনুভূতির এই জগৎ যেন আমাদের নিজেদের এনামেলস্বরূপ; বাস্তব জগৎ ঐ বালুকণা বা অন্যকিছু। সাধারণ লোকে কখনও ইহা বুঝিতে পারিবে না, কারণ যখনই সে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তখনই বাহিরে এনামেল নিক্ষেপ করিবে ও নিজের সেই এনামেলটিই দেখিবে। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ মনেরও অতীত। মন তাঁহার হস্তে একটি যন্ত্রতুল্য। তাঁহারই চৈতন্য মনের ভিতর দিয়া আসিতেছে। তুমি যখন মনের পশ্চাতে দ্রষ্টারূপে থাক, তখনই উহা চৈতন্যময় হইয়া উঠে। যখন মানুষ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, তখন উহা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়, উহার অস্তিত্বই থাকে না। ইহা হইতে বুঝা গেল—চিত্ত বলিতে কি বুঝায়। উহা মনের উপাদানস্বরূপ—বৃত্তিগুলি উহার তরঙ্গস্বরূপ, যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কার্য করে, তখনই উহা ঐ তরঙ্গস্বরূপ, যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কার্য করে, তখনই উহা ঐ তরঙ্গরূপ ধারণ করে। এই বৃত্তিগুলিই আমাদের জগৎ।

আমরা হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাই না, কারণ উহার উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত। যখন তরঙ্গগুলি শান্ত হয়, জল স্থির হইয়া যায়, তখনই কেবল উহার তলদেশের ক্ষণিক দর্শন পাওয়া সম্ভব। যদি জল ঘোলা থাকে বা উহা ক্রমাগত নড়িতে থাকে, তাহা হইলে উহার তলদেশ কখনই দেখা যাইবে না। যদি উহা

নির্মল থাকে এবং উহাতে একটিও তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ দেখিতে পাইব। হ্রদের তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—হ্রদটি চিত্ত এবং উহার তরঙ্গগুলি বৃত্তিস্বরূপ। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন ত্রিবিধ ভাবে অবস্থান করে; প্রথমটি অন্ধকারময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পশু ও মূর্খদিগের মন; উহার কার্য কেবল অপরের অনিষ্ট করা; এইরূপ মনে আর কোনপ্রকার ভাব উদিত হয় না। দ্বিতীয়, মনের ক্রিয়াশীল অবস্থা রজঃ—এ অবস্থায় কেবল প্রভুত্ব ও ভোগের ইচ্ছা থাকে; আমি ক্ষমতাশালী হইব ও অপরের উপর প্রভুত্ব করিব, তখন এই ভাব থাকে। তারপর যে অবস্থা, তাহাকে বলা হয় ‘সত্ত্ব’—ইহা শান্ত; এ অবস্থায় সকল তরঙ্গ থামিয়া যায়, মন-রূপ হ্রদের জল নির্মল হইয়া যায়—ইহা নিষ্ক্রিয় নয়, বরং অতিশয় ক্রিয়াশীল অবস্থা। শান্ত ভাব শক্তির উচ্চতম বিকাশ; ক্রিয়াশীল হওয়া তো সহজ। লাগাম ছাড়িয়া দিলে অশ্বেরা তোমাকে সুদ্ধ লইয়া ছুটিতে থাকিবে।

যে-কেহ এরূপ করিতে পারে; কিন্তু যিনি এইরূপ লম্ফমান অশ্বকে থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশক্তিধর পুরুষ। ছাড়িয়া দেওয়া ও বেগ সংযত করা—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন? শান্ত ব্যক্তি অলস ব্যক্তির মত নয়। সত্ত্বভাবকে জড়তা বা অলসতা মনে করিও না। যিনি মনের এই তরঙ্গগুলি নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছেন, তিনিই শান্ত পুরুষ। ক্রিয়াশীলতা নিম্নতর শক্তির ও শান্তভাব উচ্চতর শক্তির প্রকাশ।

এই চিত্ত সর্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে বাহিরে আকর্ষণ করিতেছে। চিত্তকে দমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা ও উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চৈতন্যঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে ফিরানো—ইহাই যোগের প্রথম সোপান; কারণ, কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার প্রকৃত পথে যাইতে পারে।

যদিও উচ্চতম হইতে নিম্নতম সকল প্রাণীর মধ্যেই এই চিত্ত রহিয়াছে, তথাপি কেবল মনুষ্যদেহেই উহাকে আমরা বুদ্ধিরূপে বিকশিত দেখিতে পাই। চিত্ত যতদিন না বুদ্ধির আকার ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার পক্ষে এই-সকল বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। গোরু বা কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি সম্ভব নয়, কারণ যদিও উহাদের মন (চিত্ত) আছে, উহা এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

এই চিত্ত অবস্থাভেদে নানা রূপ ধারণ করে, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র। মন এই চারি অবস্থায় চারি প্রকার রূপ ধারণ করিতেছে। প্রথম 'ক্ষিপ্ত'—যে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াইয়া যায়, যে অবস্থায় কর্মবাসনা প্রবল থাকে। এইরূপ মনের চেষ্টা—কেবলই সুখ দুঃখ এই দ্বিবিধ ভাবে প্রকাশিত হওয়া। তারপর 'মূঢ়' অবস্থা —উহা তমোগুণাত্মক; উহার চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট করা। 'বিক্ষিপ্ত' অবস্থায় মন কেন্দ্রের দিকেই যাইবার চেষ্টা করে। এখানে

টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেবতাদের ও মূঢ়াবস্থা অসুরদিগের স্বাভাবিক। ‘একাগ্র’ অবস্থায় চিত্তই কেন্দ্রীভূত হইতে চেষ্টা করে, এই অবস্থাই আমাদিগকে সমাধিতে লইয়া যায়।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥৩॥

তখন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ) নিজের (অপরিবর্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত।

যখনই তরঙ্গগুলি শান্ত হইয়া যায় ও হ্রদ শান্তভাব ধারণ করে, তখনই আমরা হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাই। মন সম্বন্ধেও এরূপ বুঝিতে হইবে; যখন উহা শান্ত হইয়া যায়, তখনই আমরা আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি; তখন আমরা ঐ তরঙ্গগুলির সহিত নিজেদের মিশাইয়া ফেলি না, কিন্তু নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকি।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥৪॥

অন্যান্য সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে) দ্রষ্টা চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া থাকেন।

যেমন কেহ আমার নিন্দা করিল, ইহা এক প্রকার পরিণাম—এক প্রকার বৃত্তি—আমি উহার সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলিতেছি; উহার ফল দুঃখ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতষ্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥৫॥

বৃত্তি পাঁচ প্রকার—(কয়েকটি) ক্লেশ-যুক্ত ও (অপরগুলি) ক্লেশ-শূন্য।

প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিন্দা-স্মৃতয়ঃ ॥৬॥

প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিন্দা ও স্মৃতি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ভ্রমজ্ঞান, শব্দভ্রম, নিন্দা ও স্মৃতি—বৃত্তি এই পাঁচ প্রকার।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭॥

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান ও আগম অর্থাৎ আপ্ত বা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য—এগুলিই প্রমাণ।

যখন আমাদের দুইটি অনুভূতি পরস্পরের বিরোধী না হয়, তখন তাহাকেই ‘প্রমাণ’ বলে। আমি কোন বিষয় শুনিলাম; যদি উহা পূর্বানুভূত কোন বিষয়ের বিরোধী হয়, তবে আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, কখনই উহা বিশ্বাস করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষাৎ অনুভব বা ‘প্রত্যক্ষ’—ইহা এক প্রকার প্রমাণ। যদি আমরা কোনপ্রকার চক্ষুকর্ণের ভ্রমে না পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যাইবে। আমি এই জগৎ দেখিতেছি, উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ ‘অনুমান’—তুমি কোন চিহ্ন বা লিঙ্গ দেখিলে, তাহা হইতে উহা যে-বিষয়ের সূচনা করিতেছে,

তাহা জানিতে পারিলে। তৃতীয়তঃ ‘আগম’ বা আপ্তবাক্য—যাঁহারা প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে আমাকে উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়, বিচাররূপ দীর্ঘকালব্যাপী বিরক্তিকর রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব যোগী এই সকলের পারে গিয়াছেন। তাঁহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সব এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে সবই যেন একখানি পাঠ্যপুস্তক। আমাদের মত জ্ঞানলাভের কষ্টকর প্রণালীর ভিতর দিয়া তাঁহকে যাইতে হয় না। তাঁহার বাক্যই প্রমাণ, কারণ তিনি নিজের ভিতরেই জ্ঞানস্বরূপকে উপলব্ধি করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই শাস্ত্রের রচয়িতা, আর এই জন্যই শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। যদি বর্তমান সময়ে এরূপ কেহ জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার কথা অবশ্যই প্রমাণরূপে গণ্য হইবে, অন্যান্য দার্শনিকেরা এই আপ্তবাক্য-সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আপ্তবাক্য সত্য কেন? আপ্তবাক্যের প্রমাণ—উহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যেমন পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হইলে তুমি যাহা দেখ বা আমি যাহা দেখি, তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, আপ্তবাক্যের প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব; যখন ঐ জ্ঞান যুক্তি ও মানুষের পূর্ব অভিজ্ঞতা খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায়। একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আসিয়া বলিতে পারে, ‘আমি চারিদিকে দেবতা দেখিতে পাইতেছি’—উহাকে প্রমাণ

বলা যাইবে না। প্রথমতঃ উহা সত্যজ্ঞান হওয়া চাই; দ্বিতীয়তঃ উহা যেন আমাদের পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হয়; তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উহা নির্ভর করে। অনেককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি এরূপ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ—দেখিবার আবশ্যক নাই, সে কি বলে, সেইটি জানাই বিশেষ আবশ্যক—সে কি বলে, তাহা আগে শুনিতে পাইবে। অন্যান্য বিষয়ে এ-কথা সত্য হইতে পারে; কোন লোক দুষ্ট-প্রকৃতি হইলেও সে জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা; কারণ কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধর্মের প্রকৃত সত্য লাভ করিতে পারিবে না। এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, যে ব্যক্তি নিজেকে 'আপ্ত' বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কিনা। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, সে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছে কিনা। তৃতীয়তঃ আমাদের দেখা উচিত সে ব্যক্তি যাহা বলে, তাহা মনুষ্যজাতির পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী কিনা। কোন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইলে উহা পূর্বের কোন সত্য খণ্ডন করে না, বরং পূর্ব সত্যের সহিত ঠিক খাপ খাইয়া যায়। চতুর্থতঃ অপরের পক্ষেও ঐ সত্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার উহা দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজে দেখিতে পারে, উহা সত্য কিনা। যিনি নিজের অর্জিত জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আপ্ত

নন। এই-সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রথমেই দেখিতে হইবে সেই ব্যক্তি পবিত্র, এবং তাঁহার কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য নাই, তাঁহার লাভ অথবা যশের আকাঙ্ক্ষা নাই। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, তিনি জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার আমাদিগকে এমন কিছু দেওয়া আবশ্যক, যাহা আমরা ইন্দ্রিয় হইতে লাভ করিতে পারি না ও যাহা জগতের কল্যাণকর। তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, উহা অন্যান্য সত্যের বিরোধী না হয়; অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ কর। চতুর্থতঃ সেই ব্যক্তিই যে কেবল ঐ বিষয়ের অধিকারী, আর কেহ নয়, তাহা হইবে না। অপরের পক্ষেও যাহা লাভ করা সম্ভব, তিনি নিজের জীবনে তাহা কেবল কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইবেন। তাহা হইলে প্রমাণ তিন প্রকারঃ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অনুমান ও আপ্তবাক্য। এই 'আপ্ত' কথাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে পারিতেছি না। ইহাকে 'inspired' (অনুপ্রাণিত) শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; কারণ এই অনুপ্রেরণা বাহির হইতে আসে বলিয়া মনে হয়, আর ঐ জ্ঞান ভিতর হইতে আসে। 'আপ্ত'-শব্দের আক্ষরিক অর্থ—যিনি পাইয়াছেন।

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥৮॥

বিপর্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়।

আর এক প্রকার বৃত্তি এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রান্তি। ইহাকে 'বিপর্যয়' বলে; যাহা শুক্তিতে রজত-ভ্রম।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥৯॥

কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ সেই শব্দপ্রতিপাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহাকে বিকল্প অর্থাৎ শব্দ-জাত ভ্রম বলে।

বিকল্প-নামে আর এক প্রকার বৃত্তি আছে। একটা কথা শুনিলাম, তখন আর আমরা উহার অর্থবিচার করিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলাম। ইহা চিত্তের দুর্বলতার চিহ্ন। সংযম-বিষয়ক মতবাদটি এখন বেশ বুঝা যাইবে। মানুষ যত দুর্বল হয়, তাহার সংযমের ক্ষমতা ততই কম। সর্বদা এই সংযমের মানদণ্ড দ্বারা আত্মপরীক্ষা করিবে। যখন তোমার ক্রুদ্ধ অথবা দুঃখিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন বিচার করিয়া দেখ যে, কোন একটি সংবাদ তোমার নিকট আসিবামাত্র কেমন করিয়া তোমার মন একটি বৃত্তিতে পরিণত হইতেছে।

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥১০॥

যে বৃত্তি শূন্যভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই বৃত্তিই নিদ্রা।

আর এক প্রকার বৃত্তির নাম 'নিদ্রা'—স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। আমরা যখন জাগিয়া উঠি, তখন আমরা জানিতে পারি যে, আমরা ঘুমাইতেছিলাম। অনুভূত বিষয়েরই কেবল স্মৃতি হইতে পারে। যাহা আমরা অনুভব করি না, আমাদের সেই বিষয়ের কোন স্মৃতি আসিতে পারে না। প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াই চিত্তহ্রদের একটি তরঙ্গ। নিদ্রায় যদি মনের কোন প্রকার বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় আমাদের ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক কোন অনুভূতিই থাকিত না, সুতরাং আমরা উহা স্মরণও করিতে পারিতাম না। আমরা যে নিদ্রাবস্থাটি স্মরণ করিতে পারি, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, নিদ্রাবস্থায় মনে এক প্রকার তরঙ্গ ছিল। 'স্মৃতি' আর এক প্রকারের বৃত্তি।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥১১॥

অনুভূত বিষয়সকল যখন আমাদের মন হইতে চলিয়া না যায় (যখন সংস্কারবশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয়), তাহাকে স্মৃতি বলে।

পূর্বে যে চারি প্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি হইতেই স্মৃতি আসিতে পারে। মনে কর, তুমি একটি শব্দ শুনিলে। ঐ শব্দটি যেন চিত্তহ্রদে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্য; উহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গটি আবার আরও

অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা উৎপন্ন করে। ইহাই স্মৃতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যখন নিদ্রা-নামক তরঙ্গবিশেষ চিত্তের ভিতর স্মৃতিরূপ তরঙ্গপরম্পরা উৎপন্ন করে, তখন উহাকে 'স্বপ্ন' বলে। জাগ্রৎকালে যাহাকে 'স্মৃতি' বলে, নিদ্রাকালে সেইরূপ তরঙ্গকেই 'স্বপ্ন' বলে।

অভ্যাসবইরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥১২॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ হয়।

এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে মন বিশেষরূপে নির্মল, সৎ ও বিচারপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অভ্যাস করিবার আবশ্যক কি? কারণ প্রত্যেক কার্যই হ্রদের উপরিভাগে কম্পনশীল স্পন্দনস্বরূপ। এই কম্পন কালে মিলাইয়া যায়; থাকে কী? সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে। মনে এইরূপ অনেক সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্র হইয়া অভ্যাসরূপে পরিণত হয়। 'অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব'—এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নয়, উহা প্রথম স্বভাবও বটে—মানুষের সমুদয় স্বভাবই ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছি, তাহা পূর্ব অভ্যাসের ফল। সমুদয় অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে আমাদের মনে সান্ত্বনা আসে, কারণ যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যখন ইচ্ছা ঐ

অভ্যাস দূর করিতেও পারি। আমাদের মনের ভিতর দিয়া যে চিন্তাস্পন্দগুলি চলিয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটি এক-একটি দাগ রাখিয়া যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি। আমাদের চরিত্র এই-সকল সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ। যখন কোন বিশেষ বৃত্তিতরঙ্গ প্রবল হয়, তখন মানুষ সেই ভাবে ভাবান্বিত হয়। যখন সদগুণ প্রবল হয়, তখন মানুষ সৎ হইয়া যায়; যদি মন্দভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ হইয়া যায়। যদি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ সুখী হইয়া থাকে। অসৎ অভ্যাসের একমাত্র প্রতিকার—তাহার বিপরীত অভ্যাস। যত কিছু অসৎ অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল সৎ অভ্যাসের দ্বারা সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কেবল সৎকার্য করিয়া যাও, অবিরতভাবে পবিত্র চিন্তা কর; অসৎ সংস্কার-নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কখনও বলিও না, অমুকের আর কোন আশা নাই; কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকারের চরিত্রের পরিচয় দিতেছে। চরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, নূতন ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা ঐগুলিকে দূর করা যাইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃপুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। পুনঃপুনঃ অভ্যাসই চরিত্র সংশোধন করিতে পারে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥১৩॥

ঐ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিবার যে নিয়ত চেষ্টা, তাহাকে 'অভ্যাস' বলে।

অভ্যাস কাহাকে বলে? চিত্তরূপী মনকে দমন করিবার চেষ্টা অর্থাৎ উহার তরঙ্গাকারে বহির্গমন নিবারণ করিবার চেষ্টাই অভ্যাস।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥

দীর্ঘকাল সর্বদা তীব্র শ্রদ্ধার সহিত (সেই পরম-পদ-প্রাপ্তির) চেষ্টা করিলেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হইয়া যায়।

এই সংযম একদিনে আসে না, দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস করিলে পর আসে।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥

দৃষ্ট অথবা শ্রুত সর্বপ্রকার বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে একটি অপূর্ব ভাব আসে, যাহাতে তিনি সমস্ত বিষয়বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে 'বৈরাগ্য' বা অনাসক্তি বলে।

দুইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কার্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক—(১) আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা, (২) অপরের অভিজ্ঞতা। এই দুই শক্তি আমাদের মনোহ্রদে নানা তরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে। বৈরাগ্য এই

শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শক্তিস্বরূপ। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন—এই কার্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক শক্তি-দ্বয়কে ত্যাগ করিবার শক্তি লাভ করা। মনে কর, আমি একটি পথ দিয়া যাইতেছি, একজন লোক আসিয়া আমার ঘড়িটি কাড়িয়া লইল। ইহা আমার নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি, আমি নিজে দেখিলাম, উহা আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ বৃত্তির আকারে পরিণত করিল। ঐ ভাব আসিতে দিবে না। যদি উহা নিবারণ করিতে না পার, তবে তোমার কোনই মূল্য নাই। যদি নিবারণ করিতে পার, তবেই তোমার বৈরাগ্য আছে, বুঝা যাইবে। আবার সংসারী লোক যে বিষয়ভোগ করে, তাহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, বিষয়ভোগই জীবনের চরম লক্ষ্য। এগুলি আমাদের ভয়ানক প্রলোভন। ঐগুলিকে অস্বীকার করা ও ঐগুলি লইয়া মনকে বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই বৈরাগ্য। স্বানুভূত ও পরানুভূত বিষয় হইতে আমাদের যে দুই প্রকার কার্যপ্রবৃত্তি জন্মায়, সেগুলিকে দমন করা ও এইরূপে চিত্তকে উহাদের বশীভূত হইতে না দেওয়াকে বৈরাগ্য বলে। প্রবৃত্তিগুলি যেন আমার আয়ত্তে থাকে, আমি যেন উহাদের আয়ত্তাধীন না হই —এই প্রকার মানসিক শক্তিকে বৈরাগ্য বলে; এই বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র উপায়।

তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥১৬॥

যে তীব্র বৈরাগ্য লাভ হইলে আমরা গুণগুলিতে পর্যন্ত বীতরাগ হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়।

যখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি আসক্তিকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করায়, তখনই উহাকে শক্তির উচ্চতম বিকাশ বলা যায়। প্রথমে পুরুষ বা আত্মা কী ও গুণগুলিই বা কী, তাহা আমাদের জানা উচিত। যোগদর্শনের মতে সমুদয় প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বা গুণ আছে; ঐ গুণগুলির একটির নাম তমঃ অপরটি রজঃ ও তৃতীয়টি সত্ত্ব। এই তিন গুণ বাহ্যজগতে অন্ধকার বা অলসতা, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ও উহাদের সামঞ্জস্য—এই ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতিতে যত বস্তু আছে, যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, সবই এই তিন শক্তির বিভিন্ন সমবায়ে উৎপন্ন। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে নানাপ্রকার তত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছেন; মনুষ্যের আত্মা ইহাদের সবগুলির বাহিরে—প্রকৃতির বাহিরে; উহা স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ ও পূর্ণস্বরূপ; আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃতির উপরে আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড়। এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও প্রকৃতির ভিতরে। চিন্তাও প্রকৃতির অন্তর্গত। চিন্তা হইতে অতি স্থূলতম ভূত পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত—প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই প্রকৃতি মনুষ্যের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে; পঞ্চদশ সূত্রে বর্ণিত এই

বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতি বশীভূত হয় বলিয়া উহা আত্মার প্রকাশের পক্ষে অতিশয় সাহায্যকারী। পরের সূত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ একাগ্রতার লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাই যোগীর চরম লক্ষ্য।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ 'সম্প্রজ্ঞাতঃ '॥১৭॥

যে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা অনুগত থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সম্যক্ জ্ঞানপূর্বক সমাধি বলে।

সমাধি দুই প্রকার। একটিকে 'সম্প্রজ্ঞাত' ও অপরটিকে 'অসম্প্রজ্ঞাত' বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার সমুদয় শক্তি আসে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি প্রকার। প্রথম প্রকারকে 'সবিতর্ক সমাধি' বলে। এই সমাধিতেই মনকে অন্যান্য বিষয় হইতে সরাইয়া বিষয়বিশেষের পুনঃপুনঃ অনুধ্যানে নিযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় দুই প্রকারঃ (১) চতুর্বিংশতি (জড়) তত্ত্ব ও (২) চেতন পুরুষ। যোগের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। এই সাংখ্যদর্শনের বিষয় তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, মন বুদ্ধি অহঙ্কার—ইহাদের এক সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে। উহাকে 'চিত্ত' বলে, চিত্ত হইতেই উহাদের উৎপত্তি। এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে চিন্তারূপে পরিণত করে। আবার শক্তি ও ভূত

উভয়েরই কারণস্বরূপ এক পদার্থ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাকে 'অব্যক্ত' বলে—উহা সৃষ্টির প্রাক্কালীন প্রকৃতির অপ্রকাশিত অবস্থা। কল্পান্তে সমুদয় প্রকৃতিই উহাতে প্রত্যাবর্তন করে, আবার কিছুকাল পরে পরকল্পে উহা হইতেই সব পুনরাবির্ভূত হয়। এই সমুদয়ের অতীত প্রদেশে চৈতন্যঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্রকৃতি শক্তি। কোন বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই আমরা উহার উপর ক্ষমতা লাভ করি। এইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে থাকে, তখনই উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। যে প্রকার সমাধিতে বাহ্য স্থূল ভূতগণই ধ্যেয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে। 'বিতর্ক' অর্থে প্রশ্ন—'সবিতর্ক' অর্থে প্রশ্নের সহিত। যে প্রকার ধ্যানে ভূতসমূহ উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি ঐরূপ ধ্যানপরায়ণ পুরুষকে প্রদান করে—যেন এইজন্যই ভূতগুলিকে প্রশ্ন করা—তাহাকে 'সবিতর্ক' বলে। কিন্তু শক্তি লাভ করিলেই মুক্তি লাভ হয় না। উহা কেবল ভোগের জন্য চেষ্টা মাত্র। আর এই জীবনে প্রকৃত ভোগসুখ হইতেই পারে না। ভোগসুখের অন্বেষণ বৃথা, ইহাই জগতে অতি প্রাচীন উপদেশ; কিন্তু মানুষের পক্ষে ইহা ধারণা করা অতি কঠিন। যখন সে ইহার ধারণা করিতে পারে, তখন সে জড় জগতের অতীত হইয়া মুক্ত হইয়া যায়। যেগুলিকে সাধারণতঃ গুহ্যশক্তি বলে, তাহা লাভ করিলে ভোগের বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু পরিশেষে তাহা হইতে আবার যন্ত্রণাও বৃদ্ধি

পায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিয়া পতঞ্জলি এই গুহ্যশক্তিলাভ সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই-সকল শক্তির প্রলোভন হইতে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেও তিনি ভুলেন নাই।

আবার সেই ধ্যানেই যখন ঐ ভূতসমূহকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক্ করিয়া ঐগুলির স্বরূপ চিন্তা করা করা যায়, তখন সেই সমাধিকে নির্বিতর্ক সমাধি বলে। যখন ধ্যান আর এক সোপান অগ্রসর হয় এবং তন্মাত্রগুলিকে ধ্যানের বিষয় করিয়া উহাদিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা করা যায়, তখন ঐ ধ্যানকে 'সবিচার সমাধি' বলে। আবার ঐ সমাধিতে যখন ঐ সূক্ষ্মভূতগুলিকে দেশকাল-বিবর্জিত উহাদের স্বরূপে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে 'নির্বিচার সমাধি' বলে। পরবর্তী সোপানে সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় প্রকার ভূতের চিন্তাই পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণকে— মনকেই ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। যখন অন্তঃকরণকে রজস্তমোগুণ হইতে পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা হয়, তখন উহাকে 'সানন্দ সমাধি' বলে। যখন মনই ধ্যানের বিষয় হয়, যখন ঐ সমাধি একাগ্র ও পরিপক্ক হইয়া যায়, যখন স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় ভূতের চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, অন্যান্য বিষয় হইতে পৃথক্কৃত হইয়া কেবল সাত্ত্বিক অহঙ্কার মাত্র বর্তমান থাকে, তখন উহাকে 'অস্মিতা-সমাধি' বলে। এই অবস্থাতেও সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে বেদে 'বিদেহ' বলিয়া

থাকে। তিনি নিজেকে স্থূলদেহশূন্যরূপে চিন্তা করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজেকে সূক্ষ্মশরীরধারী বলিয়া চিন্তা করিতে হইবেই। যাঁহারা এই অবস্থায় থাকিয়া সেই পরমপদ লাভ না করিয়া প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' বলে; কিন্তু যাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট নন, তাঁহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তি লাভ করেন।

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষো হন্যঃ॥১৮॥

অন্যপ্রকার সমাধিতে সর্বদা সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস করা হয়, কেবল চিত্তের দৃঢ় সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাতীত 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'; ঐ সমাধি আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না—আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না। এক ব্যক্তি সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুনরায় পতন হইবে। যতক্ষণ না আত্মা প্রকৃতির অতীত অবস্থায় (সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরও বাহিরে) যাইতে পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে। যদিও এই ধ্যানের প্রণালী খুবই সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণালী এইঃ মনকেই ধ্যানের বিষয় কর; যখনই মনে কোন চিন্তা আসিবে, তখনই উহা দমিত কর; মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা আসিতে না দিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে শূন্য কর। যখনই আমরা যথার্থরূপে ইহা

সাধন করিতে পারিব, সেই মুহূর্তেই আমরা মুক্তি লাভ করিব। পূর্ব সাধন যাহাদের আয়ত্ত হয় নাই, তাহারা যখন মনকে শূন্য করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের চিত্ত অজ্ঞানস্বভাব তমোগুণ দ্বারা আবৃত্ত হইয়া যায়, তমোগুণ তাহাদের মনকে অলস ও অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। তাহারা কিন্তু মনে করে—আমরা মনকে শূন্য করিতেছি। ইহা ঠিকঠিকভাবে সাধন করিতে পারা উচ্চতম শক্তির প্রকাশ—সংযমের চূড়ান্ত। যখন এই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়, তখন ঐ সমাধি নির্বীজ হইয়া যায়।—ইহার অর্থ কি? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, উহারা সংস্কার বা বীজাকারে থাকে, আবার সময় আসিলে পুনরায় তরঙ্গাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন সংস্কারগুলিকে পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়, যখন মনও প্রায় বিনষ্ট হইয়া আসে, তখনই সমাধি নির্বীজ হইয়া যায়। তখন মনের ভিতর এমন কোন সংস্কার-বীজ থাকে না, যাহা হইতে এই জীবন-লতিকা পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে—যাহা হইতে এই অবিরাম জন্মমৃত্যু আবর্তিত হইতে পারে।

অবশ্য তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, যেখানে জ্ঞান থাকিবে না, যেখানে মন থাকিবে না, সে আবার কি প্রকার অবস্থা? যাহাকে আমরা ‘জ্ঞান’ বলি, তাহা ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় এক নিম্নতর অবস্থামাত্র। এইটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রান্তদ্বয় প্রায় একই প্রকার দেখায়। ইথারের কম্পন মৃদুতম হইলে উহাকে ‘অন্ধকার’ বলে,

মধ্য অবস্থায় ‘আলোক’ উহার উচ্চতম কম্পন আবার অন্ধকার। কিন্তু ঐ দুই প্রকার অন্ধকারকে কি এক বলিতে হইবে? উহার একটি—প্রকৃত অন্ধকার, অপরটি—অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহারা দেখিতে একই প্রকার। এইরূপে অজ্ঞান সর্বাপেক্ষা নিম্নাবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থা, আর ঐ জ্ঞানের অতীত একটি উচ্চ অবস্থা আছে। কিন্তু অজ্ঞানাবস্থা ও জ্ঞানাতীত অবস্থা দেখিতে একই প্রকার। আমরা যাহাকে ‘জ্ঞান’ বলি, তাহা এক উৎপন্ন দ্রব্য —উহা একটি মিশ্র পদার্থ, উহা প্রকৃত সত্য নয়।

এই উচ্চতর সমাধি ক্রমাগত অভ্যাস করিলে কি ফল হইবে? উহার ফলে আমাদের অস্থিরতা ও জড়ত্বের দিকে মনের যে একটা প্রবণতা ছিল, তাহা তো নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তিরও নাশ হইয়া যাইবে। অপরিষ্কৃত সুবর্ণ হইতে উহার খাদ বাহির করিবার জন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। যখন খনি হইতে উত্তোলিত ধাতুকে গলান হয়, তখন যে রাসায়নিক পদার্থগুলি উহার সঙ্গে মিশান হয়, সেগুলি ঐ খাদের সহিত গলিয়া যায়। এই প্রকারেই সর্বদা সংযম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্বতন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ও সৎপ্রবৃত্তিগুলিও চলিয়া যাইবে। এইরূপে সদসৎ প্রবৃত্তিদ্বয় পরস্পরকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, ভালমন্দ সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া আত্মা স্ব-মহিমায় সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞরূপে অবস্থান করিবেন। সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মা সর্বশক্তিমান্ হন; জীবনে অভিমান ত্যাগ

করিয়াই জীবাত্মা মৃত্যু অতিক্রম করেন, কারণ তখন তিনি মহাপ্রাণরূপে অবস্থান করেন। তখনই জীবাত্মা জানিতে পারিবেন, কোনকালে তাঁহার জন্মমৃত্যু ছিল না, তাঁহার কখনই স্বর্গ বা পৃথিবী কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তখন তিনি বুঝিবেন, তিনি কখনও আসেন নাই, কোথাও যান নাই, আসা-যাওয়া—কেবল প্রকৃতির। আর প্রকৃতির ঐ গতিই আত্মার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। দর্পণ হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক দেওয়ালের উপর পড়িয়াছে ও নড়িতেছে। দেওয়াল যেন ভাবিতেছে, আমিই নড়িতেছি! আমাদের সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ; চিত্তই ক্রমাগত এদিক ওদিক যাইতেছে, উহা নিজেকে নানারূপে পরিণত করিতেছে, কিন্তু আমরা মনে করিতেছি, আমরা এই বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। এই সমুদয় অজ্ঞানই চলিয়া যাইবে। সেই সিদ্ধাবস্থায় মুক্ত আত্মা যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন—প্রার্থনা বা ভিক্ষা নয়, আজ্ঞা করিবেন—তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হইবে; তিনি যাহা চাহিবেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন।

সাংখ্যদর্শনের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এই দর্শনের মতে জগতের ঈশ্বর কেহ থাকিতে পারেন না, কারণ যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মা, আবার আত্মা হয় বদ্ধ, না হয় মুক্ত। যে আত্মা প্রকৃতিদ্বারা বদ্ধ বা বশীভূত, তিনি কিরূপে সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি তো নিজেই ক্রীতদাস। অপর পক্ষে আত্মা যদি মুক্তই হন, তবে মুক্ত আত্মা কেন সৃষ্টি করিবেন, কেনই বা

এই সমুদয় জগতের ক্রিয়াদি নির্বাহ করিবেন? উঁহার কোন বাসনা নাই, সুতরাং উঁহার সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই সাংখ্যদর্শন বলেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন মতবাদ অনাবশ্যক। প্রকৃতি স্বীকার করিলেই যখন সমুদয় ব্যাখ্যা করা যায়, তখন ঈশ্বরের আর প্রয়োজন কি? তবে কপিল বলেন, অনেক আত্মা এরূপ আছেন, যাঁহারা সিদ্ধাবস্থার প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছেন, কিন্তু অলৌকিক শক্তি ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারায় সিদ্ধ হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মন কিছুকাল প্রকৃতিতে লীন থাকে; তাঁহারা প্রকৃতির প্রভুরূপে পুনরাবির্ভূত হন। এরূপ ঈশ্বর আছেন বটে। আমরা সকলেই এক সময়ে এরূপ ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। সাংখ্যদর্শনের মতে বেদে যে ঈশ্বরের বর্ণনা আছে, তাহা এইরূপ একজন মুক্তাত্মার বর্ণনা মাত্র। ইহা ব্যতীত নিত্যমুক্ত, আনন্দময় বিশ্ব-সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। আবার এদিকে যোগীরা বলেন, 'না, ঈশ্বর একজন আছেন, অন্যান্য সমুদয় আত্মা—সমুদয় পুরুষ হইতে পৃথক্ একজন বিশেষ পুরুষ আছেন; তিনি সমগ্র সৃষ্টির নিত্য প্রভু, নিত্যমুক্ত, সকল গুরুর গুরু।' সাংখ্যেরা যাঁহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' বলেন, যোগীরা তাঁহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা অসিদ্ধ বা অসম্পূর্ণ যোগী। কিছুকালের জন্য তাঁহাদের চরমলক্ষ্য-প্রাপ্তি ব্যাহত হয়, তাঁহারা সেই সময়ে জগতের অংশবিশেষের নিয়ন্তারূপে অবস্থান করেন।

ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্ ॥১৯॥

(এই সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে) তাহাই দেবতা ও প্রকৃতিলীনদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ক্রমান্বয়ে ঐ পদ পূর্ণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই পূর্ণ নন।

শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্ ॥২০॥

অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, বীর্য অর্থাৎ মনের তেজ, স্মৃতি, সমাধি বা একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্য বস্তুর বিবেক হইতে এই সমাধি উৎপন্ন হয়।

যাঁহারা দেবত্বপদ অথবা কোন কল্পের শাসনভার প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদেরই কথা বলা হইতেছে। তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥২১॥

যাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বা উৎসাহী, তাঁহারা অতি শীঘ্রই যোগে কৃতকার্য হন।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোপি বিশেষঃ ॥২২॥

আবার মৃদু চেষ্টা, মধ্যম চেষ্টা, অথবা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা অনুসারে যোগিগণের সিদ্ধির বিশেষ বা ভেদ দেখা যায়।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥২৩॥

অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও (সমাধি লাভ হয়)।

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥

এক বিশেষ পুরুষ, যিনি দুঃখ কর্ম কর্মফল অথবা বাসনা দ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনিই ঈশ্বর (পরম নিয়ন্তা)।

আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র সাংখ্যাদর্শনের উপর স্থাপিত, সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই; যোগীরা কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর স্বীকার করিলেও সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিবিধ ভাবের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। যোগীদিগের 'ঈশ্বর' অর্থে জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সূচিত হন নাই, বেদমতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা। বেদের অভিপ্রায় এই—জগতে যখন সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবশ্য একজনের ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ হইবে।

যোগীরা ঈশ্বরাস্তিত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহাদের নিজস্ব এক নূতন ধরনের যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন—

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥২৫॥

অন্যেতে যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ (মাত্র) আছে, তাহা তাঁহাতে নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্ত ভাব ধারণ করে।

অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র এই দুইটি চূড়ান্ত ভাবের ভিতর মনকে ভ্রমণ করিতেই হইবে। তুমি অবশ্য সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিন্তা করিতে পার, কিন্তু উহা চিন্তা করিতে গেলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্ত দেশের চিন্তা করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি একটি ক্ষুদ্র দেশের বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহূর্তে ঐ দেশরূপ ক্ষুদ্রবৃত্ত দেখিতে পাইতেছ, সেই মুহূর্তেই উহার চতুর্দিকে অনন্ত-বিস্তৃত আর একটি বৃত্ত রহিয়াছে। কাল সম্বন্ধেও ঐ কথা। মনে কর, তুমি এক সেকেণ্ড সময়ের বিষয় ভাবিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্তকালের কথা চিন্তা করিতে হইবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ, মানুষে কেবল জ্ঞানের বীজ-ভাব আছে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিন্তা করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের নিজ মনের গঠন হইতেই বেশ প্রতিপন্ন হয় যে, এক অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে। যোগীরা সেই অনন্ত জ্ঞানকেই ঈশ্বর বলেন।

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥২৬॥

তিনি পূর্ব পূর্ব (প্রাচীন) গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নন।

আমাদের ভিতরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে বটে, কিন্তু অপর এক জ্ঞানের দ্বারা উহাকে জাগরিত করিতে হইবে। জানিবার শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে বটে, কিন্তু উহাকে জাগাইতে হইবে। আর যোগীরা বলেন, ঐরূপে জ্ঞানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব। প্রাণহীন অচেতন জড়ের প্রভাবে কখনও জ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারে না—কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাহার উন্মেষের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণের আমাদের নিকট থাকা প্রয়োজন, সুতরাং এই গুরুগণের প্রয়োজন সর্বদাই ছিল। পৃথিবী কখনও এই প্রকার আচার্য-বিরহিত হয় নাই। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। ঈশ্বর সকল গুরুর গুরু, কারণ এই-সকল গুরু যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহারা দেবতাই হউন, অথবা দেবদূতই হউন সকলেই বদ্ধ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর কাল দ্বারা বদ্ধ নন।

যোগীদিগের এই বিশেষ সিদ্ধান্ত দুইটিঃ প্রথমটি এই যে, সান্ত বস্তুর চিন্তা করিতে গেলেই মন বাধ্য হইয়াই অনন্তের চিন্তা করিবে। আর যদি ঐ মানসিক অনুভূতির এক অংশ সত্য হয়, তবে উহার অপর অংশও সত্য হইবে। কারণ—দুইটিই যখন সেই

একই মনের অনুভূতি, তখন দুইটি অনুভূতির মূল্যই সমান। মানুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানুষ অল্পজ্ঞ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান আছে—যদি এই দুইটি অনুভূতির একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ করিব না কেন? যুক্তি বলে—উভয়কে গ্রহণ কর, নতুবা উভয়কে পরিত্যাগ কর। যদি বিশ্বাস করি যে, মানব অল্পজ্ঞানসম্পন্ন, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে একজন অসীমজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ আছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। বর্তমান কালের দার্শনিকগণ যে বলিয়া থাকেন, মানুষের জ্ঞান তাহার নিজের ভিতর হইতেই বিকাশিত হয়—এ-কথা সত্য বটে, সমুদয় জ্ঞানই মানুষের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু ঐ জ্ঞানের উন্মেষের জন্য কতকগুলি অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। গুরু ব্যতীত আমরা কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। এখন কথা হইতেছে, যদি মনুষ্য দেবতা বা স্বর্গীয় দূতবিশেষ আমাদের গুরু হন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই তো সসীম; তাঁহাদের পূর্বে কে গুরু ছিলেন? বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিতেই হইবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা অবিচ্ছিন্ন নন। সেই এক অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন গুরু, যাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই, তাঁহাকেই ‘ঈশ্বর’ বলে।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥২৭॥

প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার তাঁহার প্রকাশক শব্দ।

তোমার মনে যে-কোন ভাব আছে, তাহারই একটি প্রতিরূপ শব্দও আছে; এই শব্দ ও ভাবকে পৃথক্ করা যায় না। একই বস্তুর বাহ্যভাগটিকে 'শব্দ' ও অন্তর্ভাগটিকে চিন্তা বা 'ভাব' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বিশ্লেষণবলে কেহই চিন্তাকে শব্দ হইতে পৃথক্ করিতে পারে না। কতকগুলি লোক একত্র বসিয়া কোন্ ভাবের জন্য কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির করিতে করিতে ভাষা উৎপন্ন করিয়াছে—এইরূপ অনেকের মত; কিন্তু ইহা যে ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যতদিন মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে, ততদিন শব্দ ও ভাষা দুইই রহিয়াছে। ভাব ও শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ কি? যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব্দ থাকা চাই-ই চাই, কিন্তু এক ভাব যে একটি মাত্র শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইবে, তাহা নয়। কুড়িটি ভিন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে পারে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবশ্য একটি না একটি শব্দের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এই একভাব-প্রকাশক শব্দগুলিকে যে এক প্রকার ধ্বনিবিশিষ্ট হইতেই হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় শব্দের ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সেইজন্য আমাদের টীকাকার বলিয়াছেন, 'যদিও ভাব ও শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু এক শব্দ ও এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বুঝাইতেছে না।'এই সমস্ত

শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হয় বটে, তথাপি শব্দ ও ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক। যদি বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শব্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে বলা যায়, তাহা না হইলে সেই বাচক শব্দ কখনই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। বাচক বাচ্য-পদার্থের প্রকাশক। যদি সে বাচ্য বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ব হইতে থাকে, আর আমরা যদি পুনঃপুনঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাই যে, ঐ বাচক শব্দটি ঐ বস্তুকে অনেকবার বুঝাইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ বাচ্য-বাচকের মধ্যে যথার্থ একটি সম্বন্ধ আছে। যদি ঐ পদার্থগুলি উপস্থিত নাও থাকে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি উহাদের বাচকের দ্বারাই সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে। বাচ্য ও বাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা অবশ্যম্ভাবী; অতএব যখন ঐ বাচক শব্দটি উচ্চারণ করা হইবে, তখনই উহা ঐ বাচ্য-পদার্থটির কথা মনে জাগাইয়া দিবে। সূত্রকার বলিতেছেন, ‘ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক’। কেন তিনি এই শব্দটির উপর জোর দিলেন? ‘ঈশ্বর’ ভাবটি বুঝাইবার জন্য তো শত শত শব্দ রহিয়াছে। একটি ভাবের সহিত সহস্র সহস্র শব্দের সম্বন্ধ থাকে। ঈশ্বর-ভাবটি শত শত শব্দের সহিত রহিয়াছে, উহার প্রত্যকটিই তো ঈশ্বরের বাচক। বেশ কথা, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ শব্দগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্দ বাহির করা চাই। ঐ বাচকগুলির একটি সাধারণ অধিষ্ঠান—সাধারণ শব্দ-ভূমি বাহির করিতে হইবে, আর যে বাচক শব্দটি সাধারণ বাচক হইবে, সেই শব্দটিই সর্বশ্রেষ্ঠ

বলিয়া পরিগণিত হইবে, আর সেইটিই সকলের প্রতিনিধিরূপে উহার যথার্থ বাচক হইবে। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে আমরা কণ্ঠনালী ও তালুকে শব্দোচ্চারণের আধাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। এমন কি কোন শব্দ আছে, অপর সমুদয় শব্দ যাহার প্রকাশ, যাহা সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক শব্দ?—'ওঁ' (অউম্) এই প্রকার শব্দ; উহাই সমুদয় শব্দের ভিত্তি-স্বরূপ। উহার প্রথম অক্ষর 'অ' সমুদয় শব্দের মূল—উহাই সমুদয় শব্দের কুঞ্চিকাস্বরূপ, উহা জিহ্বা অথবা তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয়। 'ম'-বর্গীয় শব্দের শেষ শব্দ, উহার উচ্চারণ করিতে হইলে ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিতে হয়। আর 'উ' এই শব্দ জিহ্বামূল হইতে মুখ-মধ্যবর্তী শব্দাধারের শেষ সীমা পর্যন্ত যেন গড়াইয়া যাইতেছে। এইরূপে 'ওঁ' শব্দটি দ্বারা সমুদয় শব্দোচ্চারণ-ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে। এই কারণে উহাই স্বাভাবিক বাচক শব্দ—উহাই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী-স্বরূপ। যত প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে—আমাদের ক্ষমতায় যত প্রকার শব্দ-উচ্চারণের সম্ভাবনা আছে, উহা সেই সকলেই সূচক।

এই-সকল আনুমানিক গবেষণা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব আছে, সব এই ওঙ্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহও এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ? ইহার সহজ উত্তর এই—

সর্বদেশে এই ওঙ্কারের ব্যবহার চলিতে পারে; তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, ‘ওঙ্কার’ তাহার প্রত্যেক সোপানেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি নাস্তিকগণ পর্যন্ত তাঁহাদের উচ্চতম আদর্শপ্রকাশের জন্য এই ‘ওঙ্কার’ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন এই ‘ওঙ্কার’ মানব জাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাতিই উহা অবলম্বন করিতে পারেন। ইংরেজী ‘গড়্’ (God) শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যদি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব ঐ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে—যেমন সগুণ (Personal), নির্গুণ (Impersonal), পূর্ণ বা পরম (Absolute) ইত্যাদি। অন্য সব ভাষায় ঈশ্বর-বাচক যে-সকল শব্দ আছে, সে সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; ঐগুলির অতি অল্প-ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু ‘ওঁ’-শব্দে উক্ত সর্বপ্রকার ভাবই রহিয়াছে। অতএব উহা প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥২৮॥

এই ওঙ্কারের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান (সমাধিলাভের উপায়)।

পুনঃপুনঃ উচ্চারণের আবশ্যকতা কি? অবশ্য আমাদের সংস্কারবিষয়ক মতবাদের কথা স্মরণ আছে; সংস্কার-সমষ্টিই আমাদের মনের মধ্যে বাস করে; ক্রমশ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হইয়া তাহারা অব্যক্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না, মনের মধ্যেই থাকে; উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই ব্যক্তভাব ধারণ করে। আণবিক স্পন্দন কখনই থামিবে না। যখন এই বিশ্বজগৎ লয় পাইবে, তখন বিরাট বিরাট স্পন্দন সব অন্তর্হিত হইবে; সূর্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী—সবই লয় হইয়া যাইবে; কিন্তু স্পন্দন—পরমাণুগুলির মধ্যে থাকিবে। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে কার্য হইতেছে, প্রত্যেক পরমাণুতে সেই কার্যই সাধিত হইতেছে। বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে যেরূপ কথিত হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ। চিত্তের স্পন্দন যখন স্তিমিত হইবে, তখনও পরমাণু-স্পন্দন চলিতে থাকিবে, উত্তেজক কারণ পাইলেই ঐগুলি পুনঃপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে। জপ বা পুনঃপুনঃ উচ্চারণের অর্থ এখন বুঝা যাইবে। আমাদের ভিতর যে-সকল আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, জপ সেগুলিকে উদ্দীপিত করিবার প্রধান সহায়। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ ভবসমুদ্রপারের একমাত্র নৌকাস্বরূপ হয়। সঙ্গের এতদূর শক্তি! বাহ্য সৎসঙ্গের যেমন শক্তি, আন্তর সৎসঙ্গেরও তেমনি শক্তি। এই ওঙ্কারের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ও অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ করা। পুনঃপুনঃ উচ্চরণ কর এবং সেই সঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর, তাহা হইলে হৃদয়ে জ্ঞানালোক আসিবে এবং আত্মা প্রকাশিত হইবেন।

কিন্তু যেমন 'ওঁ'—এই শব্দের চিন্তা করিতে হইবে, সেই সঙ্গে উহার অর্থও চিন্তা করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, কারণ পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে; এই অসৎসঙ্গের প্রভাবেই আবার সেই ক্ষত পূর্ব-বিক্রমে দেখা দেয়। একই ভাবে আমাদের ভিতরে যে-সকল শুভ সংস্কার আছে, সেগুলি এখন অব্যক্ত থাকিলেও সৎসঙ্গের দ্বারা জাগরিত হইবে—ব্যক্তভাব ধারণ করিবে। সৎসঙ্গ অপেক্ষা জগতে পবিত্রতর কিছু নাই, কারণ সৎসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলি ব্যক্ত হইবার সুযোগ পায়—চিত্তহ্রদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আসিবার উপক্রম করে।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমো হপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥

উহা হইতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় ও যোগবিঘ্নসমূহ নাশ হয়।

এই ওঙ্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল অনুভব করিবে—অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে এবং মানসিক ও শারীরিক যোগবিঘ্নসমূহ দূরীভূত হইতেছে। এখন প্রশ্ন—এই যোগবিঘ্নগুলি কি কি?

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-

ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপা স্তেহন্তরায়াঃ ॥৩০॥

রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্যমরাহিত্য, আলস্য, বিষয়তৃষ্ণা, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা লাভ না করা, ঐ অবস্থা লাভ হইলেও তাহা হইতে পতিত হওয়া—এইগুলিই চিত্তবিক্ষেপকর অন্তরায়।

ব্যাধিঃ জীবন-সমুদ্রের অপর পারে লইয়া যাইবার জন্য এই শরীরই আমাদের একমাত্র নৌকা। বিশেষভাবে ইহার যত্ন করিতে হইবে। অসুস্থ ব্যক্তি যোগী হইতে পারে না। স্ত্যানঃ মানসিক জড়তা আসিলে আমাদের যোগবিষয়ক প্রবল অনুরাগ নষ্ট হইয়া যায়; উহার অভাবে সাধন করিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প ও শক্তি প্রয়োজন, তাহার কিছুই থাকে না। সংশয়ঃ আমাদের এই যোগবিজ্ঞান-বিষয়ে বিচারজনিত বিশ্বাস যতই থাকুক না কেন, যতদিন দূরদর্শন-দূরশ্রবণাদি অলৌকিক অনুভূতি না আসিবে, ততদিন এই বিদ্যার সত্যতা বিষয়ে অনেক সন্দেহ আসিবে। এইগুলির একটু একটু আভাস পাইলে মন খুব দৃঢ় হইতে থাকে, ইহাতে সাধক আরও অধ্যবসায়শীল হয়। অনবস্থিতত্বঃ কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাধন করিবার সময় দেখিবে—মন বেশ সহজে একাগ্র ও স্থির হইতেছে; বোধ হইতেছে তুমি সাধনপথে দ্রুত উন্নতি করিতেছ। একদিন দেখিবে হঠাৎ তোমার এই উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল। জাহাজ চড়ায় ঠেকিলে যেরূপ অসহায় হইয়া যায়, তোমার সেইরূপ হইয়াছে। এরূপ হইলেও অধ্যবসায়শূন্য হইও না। এইরূপে বারবার উত্থান-পতন পথেই অগ্রগতি হইয়া থাকে।

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপসহভুব ॥৩১॥

দুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস, এইগুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

যখনই একাগ্রতা অভ্যাস করা যায়, তখনই মন ও শরীর সম্পূর্ণ স্থিরভাব ধারণ করে। সাধন যখন ঠিক পথে চালিত না হয়, অথবা যখন চিত্ত যথেষ্ট সংযত না থাকে, তখনই এই বিঘ্নগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। ওঙ্কার জপ ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে মন দৃঢ় হয়, এবং দেহে মনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়। সাধনপথে প্রায় সকলেরই এইরূপ স্নায়বীয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ওদিকে খেয়াল না করিয়া সাধন করিয়া যাও। সাধনের দ্বারাই ওগুলি চলিয়া যাইবে, তখন আসন স্থির হইবে।

তৎপ্রতিযেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥৩২॥

ইহা নিবারণের জন্য ‘এক-তত্ত্ব’ অভ্যাস আবশ্যক।

কিছুক্ষণের জন্য মনকে কোন একটি বিষয়বিশেষের আকারে আকারিত করিবার চেষ্টা করিলে পূর্বোক্ত বিঘ্নগুলি চলিয়া যায়। এই উপদেশটি খুব সাধারণভাবে দেওয়া হইল। পরবর্তী সূত্রগুলিতে এই উপদেশটিই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইবে এবং বিশেষ বিশেষ ধ্যেয় বিষয়ে এই সাধারণ উপদেশের প্রয়োগ উপদিষ্ট হইবে।এক

প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে খাটিতে পারে না, এইজন্য নানাপ্রকার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে পারেন—কোন্‌টি তাঁহার পক্ষে খাটে।

মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপু ণ্যা-

পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥৩৩॥

সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও পাপীর প্রতি যথাক্রমে বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষার ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়।

আমাদের এই চারি প্রকার ভাব থাকাই আবশ্যক। আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্ব রাখা, দীনজনের প্রতি দয়াবান্ হওয়া, লোককে সৎকর্ম করিতে দেখিলে সুখী হওয়া এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এইরূপ বিষয়গুলি যখন আমাদের সম্মুখে আসে, তখন সেইগুলির প্রতিও আমাদের ঐরূপ ভাব ধারণ করা আবশ্যক। যদি বিষয়টি সুখকর হয়, তবে উহার প্রতি ‘মৈত্রী’ অর্থাৎ অনুকূল ভাব ধারণ করা আবশ্যক। এইরূপে যদি কোন দুঃখকর ঘটনা আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের অন্তঃকরণ উহার প্রতি ‘করুণা’ভাবাপন্ন হয়। যদি উহা কোন শুভ বিষয় হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আর অসৎ বিষয় হইলে সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনের এই-সকল ভাব আসিলে মন শান্ত হইয়া

যাইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ গোলযোগ ও অশান্তির কারণ মনের ঐ-সকল ভাব ধারণ করিবার অক্ষমতা। মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিল, অমনি আমি তাহার প্রতিকার করিতে উদ্যত হইলাম। আর আমরা যে কোন অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ না লইয়া থাকিতে পারি না, তাহার কারণ আমরা চিত্তকে সংযত রাখিতে পারি না। চিত্ত উহার প্রতি তরঙ্গাকারে ধাবমান হয়; আমরা তখন মনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। আমাদিগের মনে ঘৃণা অথবা অপরের প্রতি অনিষ্টভাব-পোষণরূপ যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা শক্তির অপচয়-মাত্র। আর কোন অশুভ চিন্তা বা ঘৃণাপ্রসূত কার্য অথবা কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার চিন্তা যদি দমন করা যায়, তবে তাহা হইতে শুভকারী শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত থাকিবে। সংযমের দ্বারা আমাদের যে কিছু ক্ষতি হয়, তাহা নয়, বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে। যখনই আমরা ঘৃণা অথবা ক্রোধবৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহা আমাদের অনুকূল শুভশক্তিরূপে সঞ্চিত হইয়া উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হয়।

প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য॥৩৪॥

যথাযথ রেচক ও কুম্ভক দ্বারা (চিত্ত স্থির হয়)।

এখানে ‘প্রাণ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নয়। সমগ্র জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম ‘প্রাণ’। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু একস্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন করে, যাহা কিছু কাজ করিতে পারে, অথবা যাহার জীবন আছে, তাহাই এই প্রাণের বিকাশ। সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহার সমষ্টিকে ‘প্রাণ’ বলে। কল্পারম্ভের প্রাক্কালে এই প্রাণ প্রায় একরূপ গতিহীন অবস্থায় (অব্যক্ত) থাকে, আবার কল্পারম্ভ-কালে প্রাণ ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে; ইহাই মনুষ্যজাতি অথবা অন্যান্য প্রাণীতে স্নায়বীয় গতিরূপে প্রকাশিত, ঐ প্রাণই আবার চিন্তা ও অন্যান্য শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। সমগ্র জগৎ এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি। মনুষ্যদেহেও ঐরূপ; যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সকল পদার্থ আকাশ হইতে উৎপন্ন, আর বিভিন্ন শক্তি প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ করা ও ধারণ করার নামই ‘প্রাণায়াম’। যোগশাস্ত্রের পিতাস্বরূপ পতঞ্জলি এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী অন্যান্য যোগীরা এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া উহাকেই একটি মহতী বিদ্যা করিয়া তুলিয়াছেন। পতঞ্জলির মতে ইহা চিত্তবৃত্তিনিরোধের বহু উপায়ের মধ্যে একটি উপায় মাত্র, কিন্তু তিনি ইহার উপর বিশেষ ঝোঁক দেন নাই। তাঁহার ভাব এই যে, শ্বাস খানিকক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া আবার

ভিতরে টানিয়া লইবে এবং কিছুক্ষণ উহা ধারণ করিয়া রাখিবে, তাহাতে মন অপেক্ষাকৃত একটু স্থির হইবে। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা হইতেই 'প্রাণায়াম' নামক বিশেষ বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। এই পরবর্তী যোগিগণ কি বলেন, সে-সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা আবশ্যক।

এ-বিষয়ে পূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিলে তোমাদের মনে রাখিবার সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, এই 'প্রাণ' বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না; যে শক্তিবলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি হয়, যে শক্তিটি বাস্তবিক শ্বাসপ্রশ্বাসেরও প্রাণস্বরূপ, তাহাকে 'প্রাণ' বলে। আবার সমুদয় ইন্দ্রিয় বুঝাইতেও এই 'প্রাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমুদয়কেই 'প্রাণ' বলে। মনকেও আবার 'প্রাণ' বলে। অতএব দেখা গেল যে, 'প্রাণ'= শক্তি। তথাপি আমরা ইহাকে শক্তি-নামে অভিহিত করিতে পারি না, কারণ শক্তি ঐ প্রাণের বিকাশস্বরূপ। শক্তি ও নানাবিধ গতিরূপে ইহাই প্রকাশিত হইতেছে। মনের উপাদান চিত্ত যন্ত্রবৎ চতুর্দিক হইতে প্রাণকে আকর্ষণ করে এবং এই প্রাণ হইতেই শরীর-রক্ষার হেতুভূত ভিন্ন ভিন্ন জীবনীশক্তি এবং চিন্তা, ইচ্ছা ও অন্যান্য সমুদয় শক্তি উৎপন্ন করিতেছে। এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াদ্বারা আমরা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শরীরের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলিকে বশে আনিতে পারি। আমরা প্রথমতঃ

ঐগুলিকে চিনিতে আরম্ভ করি, পরে অল্পে অল্পে উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করি, এবং ঐগুলিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই।

পতঞ্জলির পরবর্তী যোগীদিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ আছে। একটিকে তাঁহারা ‘ইড়া’ অপরটিকে ‘পিঙ্গলা’ ও তৃতীয়টিকে ‘সুষুম্না’ বলে। তাঁহাদের মতে—পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণদিকে, ইড়া বামদিকে, আর ঐ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে শূন্য নালী সুষুম্না আছে। তাঁহাদের মতে—ইড়া ও পিঙ্গলা নামক শক্তিপ্রবাহদ্বয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রবাহিত, উহাদের সাহায্যেই আমরা শরীরের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতেছি। সুষুম্না সকলের মধ্যেই আছে বটে, তবে কেবল যোগীর শরীরেই উহার কাজ হয়। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যোগী যোগসাধনবলে নিজের দেহ পরিবর্তিত করেন। যতই সাধন করিবে, ততই তোমার দেহ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; সাধনের পূর্বে তোমার যেরূপ শরীর ছিল, পরে আর সেরূপ থাকিবে না। ব্যাপারটি অযৌক্তিক নয়; ইহা যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা যাহা কিছু নূতন চিন্তা করি, তাহাই যেন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া একটি নূতন প্রণালী নির্মাণ করিয়া দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, মনুষ্যস্বভাব এত স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন; মানুষের স্বভাবই এই যে, উহা পূর্বাবর্তিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, কারণ উহা অপেক্ষাকৃত সহজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি মনে করা যায়—মন একটি সূচি আর মস্তিষ্ক উহার সম্মুখে একটি কোমল পিণ্ডমাত্র, তাহা হইলে দেখা

যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তাই মস্তিষ্কমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, আর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ধূসর পদার্থ ঐ পথটিকে পৃথক্ রাখিবার জন্য উহার একটি সীমানা প্রস্তুত করিয়া দেয়। যদি ঐ ধূসরবর্ণ পদার্থটি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কোন স্মৃতি সম্ভব হইত না, কারণ স্মৃতির অর্থ—পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি চিন্তার উপর দাগা বুলান। হয়তো তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, যখন আমি সকলের পরিচিত কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া ঐগুলিরই ঘোরফের করিয়া কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তোমরা সহজেই আমার কথা বুঝিতে পার; ইহার কারণ আর কিছুই নয়—এই চিন্তার পথ বা প্রণালীগুলি প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কে বিদ্যমান আছে, কেবল ঐগুলিতে ফিরিয়া আসিতে হয়, এইমাত্র। কিন্তু যখনই কোন নূতন বিষয় আমাদের সম্মুখে আসে, তখনই মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালী নির্মাণ করিতে হয়; এইজন্য তত সহজে উহা বুঝা যায় না। এইজন্য মস্তিষ্ক—মানুষেরা নয়, মস্তিষ্কই—অজ্ঞাতসারে এই নূতন ধরনের ভাব দ্বারা পরিচালিত হইতে অস্বীকার করে, উহা যেন উহার গতিরোধ করে। প্রাণ নূতন নূতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, মস্তিষ্ক তাহা করিতে দিতেছে না। মানুষ যে স্থিতিশীলতার এত পক্ষপাতী ইহাই তাহার গূঢ় রহস্য। মস্তিষ্কের মধ্যে এই প্রণালীগুলি যত অল্প পরিমাণে থাকে, আর প্রাণরূপ সূচি উহার ভিতর যত অল্পসংখ্যক পথ প্রস্তুত করে, মস্তিষ্ক ততই রক্ষণশীল হইবে, ততই উহা নূতন প্রকার চিন্তা ও ভাবের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করিবে। মানুষ যতই চিন্তাশীল হয়, মস্তিষ্কের ভিতরের পথগুলি ততই অধিক ও জটিল হইবে, ততই সহজে সে নূতন নূতন ভাব গ্রহণ করিবে ও বুঝিতে পারিবে। প্রত্যেক নূতন ভাব সম্বন্ধে এইরূপ জানিবে। মস্তিষ্কে একটি নূতন ভাব আসিলেই মস্তিষ্কের ভিতর নূতন প্রণালী নির্মিত হয়। এইজন্য যোগ-অভ্যাসের সময় আমরা প্রথমে এত শারীরিক বাধা প্রাপ্ত হই, কারণ যোগ নূতন চিন্তা ও ভাবের সমষ্টি। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, ধর্মের যে অংশ প্রকৃতির জাগতিক ভাব লইয়া বেশী নাড়াচড়া করে, তাহা বহু লোকের গ্রাহ্য হয়, আর উহার অপরাংশ অর্থাৎ দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, যাহা কেবল মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি লইয়া ব্যাপৃত, তাহা সাধারণতঃ অবহেলিত হয়।

আমাদের এই জগতের সংজ্ঞা কি, তাহা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক; জগৎ আমাদের সজ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত (প্রক্ষেপিত) অনন্ত সত্তামাত্র। অনন্তের কিয়দংশ আমাদের চেতনার স্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই আমরা আমাদের ‘জগৎ’ বলিয়া থাকি। তাহা হইলেই দেখা গেল, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্রপিণ্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা—এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে। অনন্তের যেটুকু ভাগ আমাদের এই

জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি, যেটুকু দেশকালনিমিত্তরূপ পিঞ্জরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, এইটুকু লইয়া ধর্মের যে অংশ ব্যাপৃত, তাহা সহজে বোধগম্য হয়, কারণ, আমরা তো পূর্ব হইতেই তাহার মধ্যে রহিয়াছি, আর এই জগতের ভাব প্রায় স্মরণাতীত কাল হইতেই আমাদের পরিচিত। কিন্তু ধর্মের যে অংশ অনন্তের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তাহা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন; সেইজন্য উহার চিন্তায় মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীরটাই যেন বিপর্যস্ত হয়; সেইজন্য সাধন করিতে গিয়া সাধারণ মানুষ প্রথমটা চিরাভ্যস্ত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। যথাসম্ভব এই বিপর্যয়ের ভাব কমাইবার জন্যই পতঞ্জলি এই-সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন; যাহাতে এগুলি হইতে নির্বাচন করিয়া আমাদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী একটি সাধন-প্রণালী আমরা অভ্যাস করিতে পারি।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥৩৫॥

যে-সকল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক ইন্দ্রিয়বিষয়ের অনুভূতি হয়, সেই-সকল সমাধি মনের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে।

ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই ইহা আপনা-আপনি আসিতে থাকে; যোগীরা বলেন, যদি নাসিকাগ্রে মন একাগ্র করা যায়, তবে কিছু দিনের মধ্যেই অদ্ভুত সুগন্ধ অনুভব করা যায়। এইরূপে

জিহ্বামূলে মনকে একাগ্র করিলে, সুন্দর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জিহ্বাগ্রে এইরূপ করিলে দিব্য রসাস্বাদ হয়, জিহ্বামধ্যে মনঃসংযম করিলে বোধ হয়, কি এক বস্তু স্পর্শ করিলাম। তালুতে মনঃসংযম করিলে দিব্যরূপসকল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি যদি এই যোগের কিছু সাধন অবলম্বন করিয়া উহার সত্যতায় সন্দিহান হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর এই-সকল অনুভূতি হইতে থাকিলে তাহার আর সন্দেহ থাকিবে না; তখন সে অধ্যবসায়-সহকারে সাধন করিতে থাকিবে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥৩৬॥

শোকরহিত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের ধ্যানের দ্বারাও সমাধি হয়।

ইহা আর এক প্রকার সমাধি। এইরূপ ধ্যান কর যে, হৃদয়ের মধ্যে যেন একটি পদ্ম রহিয়াছে, তাহার পাপড়ি অধোমুখে; উহার মধ্য দিয়া সুষুম্না গিয়াছে। তারপর পূরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর যে, পাপড়ির সহিত ঐ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হইয়াছে, আর ঐ পদ্মের মধ্যে মহাজ্যোতিঃ রহিয়াছে। ঐ জ্যোতির ধ্যান কর।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥৩৭॥

অথবা যে হৃদয় সমুদয় ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

কোন সাধুপুরুষের কথা ধর। কোন মহাপুরুষ, যাঁহার প্রতি তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, যাঁহাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত বলিয়া জানো, তাঁহার হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর। যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরের বিষয় চিন্তা করিলে তোমার অন্তঃকরণ শান্ত হইবে। ইহা যদি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর এক উপায় আছে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা॥৩৮॥

অথবা স্বপ্নাবস্থায় কখনও কখনও যে অপূর্ব জ্ঞানলাভ হয়, তাহার (এবং নিদ্রা বা সুষুপ্তি-অবস্থায় লব্ধ সাত্ত্বিক সুখের) ধ্যান করিলেও চিত্ত প্রশান্ত হয়।

কখনও কখনও লোকে এইরূপ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেবতারা আসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, সে যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। বায়ুর মধ্য দিয়া অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, সে তাহা শুনিতেছে। ঐ স্বপ্নাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের ভাবে থাকে। জাগরণের পর ঐ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ স্বপ্নটিকে সত্য বলিয়া চিন্তা কর, উহার ধ্যান কর। তুমি যদি ইহাতেও সমর্থ না হও, তবে যে-কোন পবিত্র বস্তু তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥৩৯॥

অথবা যে-কোন জিনিষ তোমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহারই ধ্যান দ্বারা (সমাধি লাভ হয়)।

অবশ্য ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, কোন অসৎ বিষয় ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু যে-কোন সৎ বিষয় তুমি ভালবাস—যে-কোন স্থান তুমি খুব ভালবাস, যে-কোন দৃশ্য তুমি খুব ভালবাস, যে-কোন ভাব তুমি খুব ভালবাস, যাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর।

পরমা ণু-পরমমহত্ত্বা ন্তোহস্য বশীকারঃ ॥৪০॥

এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে পর্যন্ত তাঁহার মন অব্যাহত গতি লাভ করে।

মন এই অভ্যাসের দ্বারা অতি সূক্ষ্ম হইতে বৃহত্তম বস্তু পর্যন্ত সহজে ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলেই (মনোবৃত্তিরূপ) মনের তরঙ্গগুলিও ক্ষীণতর হইয়া আসে।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহী তৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেষু

ততস্থ-তদঞ্জনতা -সমাপত্তিঃ ॥৪১॥

যে যোগীর চিত্তবৃত্তিগুলি এইরূপ ক্ষীণ হইয়া যায় (বশীভূত হয়), তাঁহার চিত্ত তখন, যেমন শুদ্ধ স্ফটিক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত বস্তুর

সম্মুখে তৎসদৃশ বর্ণ ও আকার ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বস্তুতে (অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহ্য বস্তুতে) একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি লাভ হয়? আমাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, পূর্বে এক সূত্রে পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমাধির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম সমাধি স্থূল বিষয় লইয়া, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া; পরে ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বস্তু আমাদের সমাধির বিষয় হয়, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। এই-সকল সমাধির অভ্যাস দ্বারা স্থূলের ন্যায় সূক্ষ্ম বিষয়ও আমরা সহজে ধ্যান করিতে পারি। এই অবস্থায় যোগী তিনটি বস্তু দেখিতে পান—গ্রহীতা, গ্রাহ্য ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় ও মন। তিন প্রকার ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ স্থূল, যথা—শরীর বা জড় পদার্থসমুদয়। দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্ম বস্তুসমুদয়, যথা—মন বা চিত্তাদি। তৃতীয়তঃ গুণবিশিষ্ট পরুষ অর্থাৎ অস্মিতা বা অহঙ্কার। এখানে ‘আত্মা’ বলিতে উহার যথার্থ স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। অভ্যাসের দ্বারা যোগী এই-সকল ধ্যানের দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার এতাদৃশী একাগ্রতা-শক্তি লাভ হয় যে, যখনই তিনি ধ্যান করেন, তখনই অন্যান্য বস্তু মন হইতে সরাইয়া দিতে পারেন। তিনি যে-বিষয় ধ্যান করেন, সে-বিষয়ের সহিত এক হইয়া যান (তৎস্থিততা ও তদঞ্জনতা); যখন তিনি ধ্যান করেন, তিনি যেন একখণ্ড স্ফটিকতুল্য হইয়া যান;

পুষ্পের নিকট স্ফটিক থাকিলে, ঐ স্ফটিক যেন পুষ্পের সহিত প্রায় এক হইয়া যায়; যদি পুষ্পটি লোহিত হয়, তবে স্ফটিকটিও লোহিত দেখায়, যদি পুষ্পটি নীল হয়, তবে স্ফটিকটিও নীল দেখায়।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥৪২॥

শব্দ, অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞান যখন মিশ্রিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কযুক্ত সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

এখানে 'শব্দ' অর্থে কম্পন। 'অর্থ' অর্থে যে স্নায়বিক শক্তিপ্রবাহ উহাকে লইয়া ভিতরে চালিত করে, আর 'জ্ঞান' অর্থে প্রতিক্রিয়া। আমরা এ পর্যন্ত যত প্রকার ধ্যানের কথা শুনিলাম, পতঞ্জলি এ-সবগুলিকেই সবিতর্ক বলেন। ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ ধ্যানের কথা বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাধিতে আমরা বিষয়ী ও বিষয়—এই দ্বৈতভাব রক্ষা করি; শব্দ উহার অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞানের মিশ্রণে উহা উৎপন্ন হয়। প্রথম বাহ্যকম্পন—শব্দ; উহা ইন্দ্রিয়-প্রবাহদ্বারা ভিতরে প্রবাহিত হইলে তাহাকে 'অর্থ' বলে। তারপর চিত্তে এক প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ আসে, উহাকে 'জ্ঞান' বলা যায়। যাহাকে আমরা জ্ঞান (বাহ্যবস্তুর অনুভূতি) বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই তিনটির মিশ্রণ বা সমষ্টি (সঙ্কীর্ণ) মাত্র। আমরা এ পর্যন্ত যত প্রকার ধ্যানের কথা পাইয়াছি, তাহার সবগুলিতে এই

মিশ্রণই আমাদের ধ্যেয়। ইহার পরে যে সমাধির কথা বলা হইবে, তাহা উচ্চতর।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা ॥৪৩॥

যখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ স্মৃতিতে আর কোন গুণসম্পর্ক থাকে না, যখন উহা ধ্যেয় বস্তুর অর্থ-মাত্র প্রকাশ করে, তাহাই নির্বিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশূন্য সমাধি।

পূর্বে যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, এই তিনটি একত্র অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক সময় আসে, যখন উহারা আর মিশ্রিত হয় না, তখন আমরা অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি। এখন প্রথমতঃ এই তিনটি কি, তাহা আমরা বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। চিত্তের কথা ধরা যাউক —পূর্বের সেই হ্রদের উপমার কথা স্মরণ কর; চিত্তকে হ্রদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, আর শব্দ বা বাক্য অর্থাৎ বস্তুর কম্পন যেন উহার উপর একটি তরঙ্গের ন্যায় আসিতেছে। তোমার নিজের মধ্যেই ঐ স্থির হ্রদ রহিয়াছে। মনে কর, আমি 'গো' এই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম। যখনই উহা তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার চিত্তহ্রদে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইল। ঐ তরঙ্গটি 'গো'শব্দ-সূচিত ভাব; আমরা উহাকেই আকার বা অর্থ বলিয়া থাকি। তুমি যে মনে করিয়া থাক, আমি একটি 'গো'কে জানি, উহা

কেবল তোমার মনোমধ্যস্থ একটি তরঙ্গমাত্র। উহা বাহ্য ও আভ্যন্তর শব্দপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গটিও লয় পায়। একটি বাক্য বা শব্দ ব্যতীত তরঙ্গ থাকিতে পারে না। অবশ্য তোমার মনে হইতে পারে যে, যখন কেবল 'গো'-বিষয়ে চিন্তা কর অথচ বাহির হইতে কোন শব্দ কানে আসে না, তখন শব্দ থাকে কোথায়? তখন ঐ শব্দ তুমি নিজে নিজেই করিতে থাক। তুমি তখন নিজের মনে-মনেই 'গো' এই শব্দটি আস্তে আস্তে বলিতে থাক, তাহা হইতেই তোমার অন্তরে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়। শব্দের উত্তেজনা ব্যতীত কোন তরঙ্গ উঠিতে পারে না; যখন বাহির হইতে ঐ উত্তেজনা আসে না, তখন ভিতর হইতেই উহা আসে। আর যখন শব্দটি থাকে না, তখন তরঙ্গটিও থাকে না। তখন কি অবশিষ্ট থাকে? তখন ঐ প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। উহাই জ্ঞান। এই তিনটি আমাদের মনে এত দৃঢ়সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি না। যখনই শব্দ আসে, তখনই ইন্দ্রিয়গণ কম্পিত হইয়া থাকে, আর প্রবাহসকল প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহারা একটির পর আর একটি এত শীঘ্র আসিয়া থাকে যে, উহাদের মধ্যে একটি হইতে আর একটিকে বাছিয়া লওয়া অতি কঠিন; এখানে যে সমাধির কথা বলা হইল, তাহা দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে সকল সংস্কারের আধারভূমি স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই আমরা ঐগুলির মধ্যে একটি হইতে অপরটিকে

পৃথক্ করিতে পারি, ইহাকেই নির্বিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশূন্য সমাধি বলে।

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥৪৪॥

পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে যে সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধিদ্বয়ের কথা বলা হইল, তদ্দ্বারাই সবিচার ও নির্বিচার উভয় প্রকার সমাধি, যাহাদের বিষয় সূক্ষ্মতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা করা হইল।

এখানে পূর্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কেবল পূর্বোক্ত দুইটি ধ্যানের বিষয় স্থূল, এখানে ধ্যানের বিষয় সূক্ষ্ম।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গ- -পর্যবসানম্ ॥৪৫॥

সূক্ষ্মবিষয় অলিঙ্গে অর্থাৎ অব্যক্ত বা প্রধানে (প্রকৃতিতে) পর্যবসিত হয়।

ভূতগুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুকে স্থূল বলে। সূক্ষ্মবস্তু তন্মাত্র হইতে আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয়, মন (অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিস্বরূপ), অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব (যাহা সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ), সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান (প্রকৃতি অথবা অব্যক্ত), এ-সবই সূক্ষ্ম বস্তুর অন্তর্গত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল ইহার ভিতর পড়েন না।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥৪৬॥

পূর্বোক্ত সমাধিগুলি সবই সবীজ সমাধি।

এই সমাধিগুলিতে পূর্বকর্মের বীজ নাশ হয় না। সুতরাং ঐগুলি দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। তবে এগুলি দ্বারা কি হয়? তাহা পরবর্তী সূত্রগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

নির্বিচার-বৈশারদ্যে হধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥৪৭॥

নির্বিচার সমাধিতে সত্ত্বগুণপ্রভাবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হইলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়—(ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা)।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা॥৪৮॥

উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে ঋতম্ভর অর্থাৎ সত্যপূর্ণ জ্ঞান বলে। পরসূত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥৪৯॥

যে জ্ঞান বিশ্বস্ত জনের বাক্য (আপ্ত বাক্য) ও অনুমান হইতে লব্ধ হয়, তাহা সাধারণ বস্তুবিষয়ক। পূর্বকথিত সমাধি হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা উহা অপেক্ষা উচ্চতর। ইহা যেখানে পৌঁছায়, বিশ্বস্ত জনের বাক্য বা অনুমান সেখানে পৌঁছাতে পারে না।

ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধারণ-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষানুভব, তদুপস্থাপিত অনুমান ও বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই। 'বিশ্বস্ত লোক' অর্থে যোগীরা ঋষিদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, 'ঋষি' অর্থে বেদবর্ণিত ভাবগুলির দ্রষ্টা অর্থাৎ যাঁহারা সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কেবল এইজন্য যে, উহা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য। শাস্ত্র বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইলেও তাঁহারা বলেন, শুধু শাস্ত্র আমাদিগকে সত্য অনুভব করাইতে কখনই সমর্থ নয়। আমরা সমগ্র বেদ পাঠ করিলাম, তথাপি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র হইল না। কিন্তু যখন আমরা সেই শাস্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী অনুসারে কার্য করি, তখনই আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে-অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত কথাগুলির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়; যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান যেখানে ঘেঁষিতে পারে না, উহা সেখানেও প্রবেশ করিতে সমর্থ, সেখানে আপ্তবাক্যেরও কোন কার্যকারিতা নাই। এই সূত্রদ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম, উহাই ধর্মের সার, আর অবশিষ্ট যাহা কিছু—যথা ধর্মবক্তৃতাশ্রবণ অথবা ধর্মপুস্তকপাঠ বা বিচার—কেবল ঐ পথের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম নয়। কেবল বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়ে সায় দেওয়া বা না-দেওয়া প্রকৃত ধর্ম নয়। যোগীদের মূল ভাব এই যে, আমরা যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসি, ধর্মও তেমনি ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; বরং ধর্ম আরও গভীরভাবে অনুভূত হইতে পারে।

ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি ধর্মের যে-সকল প্রতিপাদ্য সত্য আছে, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ঐগুলি প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে না। চক্ষুদ্বারা আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না বা হস্তদ্বারা ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারি না। আর ইহাও জানি যে, বিচার আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে লইয়া যাইতে পারে না; উহা আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সমস্ত জীবন আমরা বিচার করিতে পারি, তথাপি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে পারিব না। এইরূপ বিচার তো সহস্রবর্ষ ধরিয়া চলিতেছে; আমরা যাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি, তাহাই ভিত্তিস্বরূপ করিয়া সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, বিচারাদি করিয়া থাকি। অতএব ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যুক্তিকে এই বিষয়ানুভূতিরূপ গণ্ডির ভিতরেই ভ্রমণ করিতে হইবে; উহা তাহার বাহিরে কখনই যাইতে পারে না। সুতরাং আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুভূতির ক্ষেত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে। যোগীরা বলেন, মানুষ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ ও বিচারশক্তি দুই-ই অতিক্রম করিতে পারে। নিজ বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিবার শক্তি মানুষের আছে, আর এই শক্তি প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জীবে অন্তর্নিহিত। যোগাভ্যাসের দ্বারা এই শক্তি জাগরিত হয়। তখন মানুষ বিচারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তর্কের অগম্য বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করে।

তজ্জঃ সংস্কারো হন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥৫০॥

এই সমাধিজাত সংস্কার অন্যান্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য সংস্কারকে আর আসিতে দেয় না।

আমরা পূর্বসূত্রে দেখিয়াছি যে, এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে যাইবার একমাত্র উপায়—একাগ্রতা। আমরা দেখিয়াছি, পূর্বসংস্কারগুলিই কেবল আমাদিগের ঐ প্রকার একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক। তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে, যখনই তোমরা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, তখনই তোমাদের নানাপ্রকার চিন্তা আসে। যখনই ঈশ্বরচিন্তা করিতে চেষ্টা কর, ঠিক সেই সময়েই ঐ-সকল সংস্কার জাগিয়া উঠে। অন্য সময়ে এগুলি তত প্রবল থাকে না, কিন্তু যখনই এগুলিকে দূর করিবার চেষ্টা কর, তখনই উহারা নিশ্চয় আসিবে; তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। ইহার কারণ কি? এই একাগ্রতা-অভ্যাসের সময়েই এগুলি এত প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি ঐগুলিকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছ বলিয়াই উহারা সমুদয় বল প্রকাশ করে। অন্যান্য সময়ে উহারা ঐভাবে বল প্রকাশ করে না। এ-সকল পূর্বসংস্কারের সংখ্যাই বা কত! চিত্তের কোন স্থানে উহারা জড়ো হইয়া রহিয়াছে, আর ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া আক্রমণের জন্য যেন সর্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ঐগুলিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে ভাবটি হৃদয়ে রাখিতে ইচ্ছা করি, কেবল সেই ভাবটিই আসে, অন্যান্য ভাবগুলি চলিয়া যায়। তাহা না হইয়া ঐগুলি ঐ সময়েই আসিবার চেষ্টা করিতেছে।

মনের একাগ্রতা-শক্তিকে বাধা দিবার ক্ষমতা সংস্কারসমূহের আছে। সুতরাং যে সমাধির কথা এইমাত্র বলা হইল, উহা অভ্যাস করা বিশেষ আবশ্যক, কারণ উহা ঐ সংস্কারগুলি দমন করিতে সমর্থ। এইরূপ সমাধি-অভ্যাসের দ্বারা যে সংস্কার উত্থিত হইবে, তাহা এত প্রবল হইবে যে, অন্যান্য সংস্কারের কার্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিবে।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব নিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥৫১॥

(অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য সমুদয় সংস্কারকে অবরুদ্ধ করে) তাহারও অবরোধ করিতে পারিলে সমুদয় নিরোধ হওয়াতে নির্বীজ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য—এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ উহা প্রকৃতি, মন ও শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞান ব্যক্তি নিজের দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। অপেক্ষাকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি মনকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উভয়েই ভ্রান্ত। আত্মা এই-সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত হন কেন? চিত্তে নানাপ্রকার তরঙ্গ উঠিয়া আত্মাকে আবৃত করে, আমরা কেবল এই তরঙ্গগুলির ভিতর দিয়াই আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। যদি ক্রোধরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, তবে আমরা

আত্মাকে ক্রোধযুক্ত মনে করি; বলিয়া থাকি আমি রুষ্ট হইয়াছি। যদি প্রেমের একটি তরঙ্গ চিত্তে উত্থিত হয়, তবে ঐ তরঙ্গে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া মনে করি, আমি ভালবাসিতেছি। যদি দুর্বলতারূপ তরঙ্গ আসে, উহাতে আত্মা প্রতিবিম্বিত হয় এবং মনে করি আমি দুর্বল। এই সংস্কারগুলি আত্মার স্বরূপকে আবৃত করিলেই এই-সব বিভিন্ন ভাব উদিত হইয়া থাকে। চিত্তহ্রদে যতদিন পর্যন্ত একটি তরঙ্গও থাকিবে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হইবে না। যে পর্যন্ত না সকল তরঙ্গ একেবারে উপশান্ত হইয়া যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কখনই প্রকাশিত হইবে না। এই কারণেই পতঞ্জলি প্রথমেই শিক্ষা দেন, এই তরঙ্গ-রূপ বৃত্তগুলি কি; তার পর বলেন, ঐগুলি দমন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি। তৃতীয়তঃ শিক্ষা দিলেন—যেমন এক বৃহৎ অগ্নি ক্ষুদ্র অগ্নিকে গ্রাস করে, তেমনি একটি তরঙ্গকে কিভাবে এত প্রবল করা যায়, যাহাতে অপর তরঙ্গগুলি একেবারে উহাতে লুপ্ত হইয়া যায়। যখন একটি মাত্র তরঙ্গ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহাকেও দমন করা সহজ হইবে। যখন উহাও চলিয়া যাইবে, তখনই সেই সমাধিকে নির্বীজ সমাধি বলে। তখন আর কিছুই থাকিবে না, আত্মা নিজ-স্বরূপে নিজ-মহিমায় অবস্থান করিবেন। আমরা তখনই জানিতে পারিব, আত্মা মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ নন, আত্মাই জগতে একমাত্র নিত্য অমিশ্র মৌলিক পদার্থ, সুতরাং

আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আত্মা অমর, অবিনশ্বর, নিত্য, চৈতন্যঘন সত্তা-স্বরূপ।

—

সাধনপাদ

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥১॥

তপস্যা, অধ্যাত্মশাস্ত্র-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্মফল-সমর্পণকে 'ক্রিয়াযোগ' বলে।

পূর্ব অধ্যায়ে যে-সকল সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা লাভ করা অতি কঠিন। এইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে ঐ-সকল সমাধিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার প্রথম সোপানকে 'ক্রিয়াযোগ' বলে। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ-কর্মদ্বারা যোগের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যেন অশ্ব, মন তাহার লাগাম, বুদ্ধি সারথি, আত্মা সেই রথের আরোহী আর এই শরীর রথস্বরূপ। মানুষের আত্মাই গৃহস্বামী, রাজা-রূপে এই রথে তিনি বসিয়া আছেন। অশ্বগণ অতি প্রবল হয়, রশ্মিদ্বারা সংযত না থাকিতে চায়, আর যদি বুদ্ধিরূপ সারথি ঐ অশ্বগণকে কিরূপে সংযত করিতে হইবে তাহা না জানে, তবে এই রথের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ সংযত থাকে, আর মনরূপ রশ্মি বুদ্ধিরূপ সারথির হস্তে দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে, তবে ঐ রথ ঠিক উহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে। এখন

এই তপস্যা-শক্তির অর্থ কি? ‘তপস্যা’ শব্দের অর্থ—এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিবার সময় খুব দৃঢ়ভাবে রশ্মি ধরিয়া থাকা, উহাদিগকে ইচ্ছামত কার্য করিতে না দিয়া আত্মবশে রাখা।

পাঠ বা স্বাধ্যায়। এক্ষেত্রে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হইবে? নাটক, উপন্যাস বা গল্পের বই পড়া নয়—যে-সকল গ্রন্থে আত্মার মুক্তিবিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ আছে, সেই সকল গ্রন্থপাঠ। আবার ‘স্বাধ্যায়’ বলিতে বিতর্কমূলক পুস্তকপাঠ মোটেই বুঝায় না। বুঝিতে হইবে যোগী বিতর্কমূলক পাঠ ও আলোচনা শেষ করিয়াছেন; তিনি তৃপ্ত, উহাতে আর তাঁহার রুচি নাই। তিনি পাঠ করেন শুধু তাঁহার ধারণাগুলি দৃঢ় করিবার জন্য। দুই প্রকার শাস্ত্রীয় জ্ঞান আছেঃ ‘বাদ’ (যাহা তর্ক-যুক্তি ও বিচারাত্মক) ও সিদ্ধান্ত (মীমাংসাত্মক)। অজ্ঞানাবস্থায় মানুষ প্রথমোক্ত প্রকার জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, উহা তর্কযুদ্ধ-স্বরূপ—প্রত্যেক বিষযের স্বপক্ষ-বিপক্ষ দেখিয়া বিচার করা; এই বিচার শেষ হইলে তিনি কোন এক মীমাংসায়—সমাধানে উপনীত হন। কিন্তু শুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। এই সিদ্ধান্তবিষয়ে মনের ধারণা প্রগাঢ় করিতে হইবে। শাস্ত্র অনন্ত, সময় সংক্ষিপ্ত, অতএব সকল বস্তুর সারভাগ গ্রহণ করা জ্ঞানলাভের গোপন রহস্য। ঐ সারটুকু লইয়া ঐ উপদেশমত জীবনযাপন করিতে চেষ্টা কর। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—যদি তুমি কোন রাজহংসের সম্মুখে একপাত্র জলমিশ্রিত দুগ্ধ ধর, তবে সে দুগ্ধটুকু পান করিবে,

জলটুকু পড়িয়া থাকিবে। এইরূপে জ্ঞানের যেটুকু প্রয়োজনীয় অংশ, তাহা গ্রহণ করিয়া অসারটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আবশ্যক। অন্ধভাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না। যোগী এই তর্কযুক্তির অবস্থা অতিক্রম করিয়া পর্বতবৎ একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার তখন একমাত্র উদ্দেশ্য—ঐ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, বিচার করিও না; যদি কেহ জোর করিয়া তোমার সহিত তর্ক করিতে আসে, তুমি তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। কোন তর্কের উত্তর না দিয়া শান্তভাবে সেখান হইতে চলিয়া যাইবে, কারণ তর্ক কেবল মনকে চঞ্চল করে। তর্কের প্রয়োজন ছিল কেবল বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য; অযথা বুদ্ধিকে চঞ্চল করিবার প্রয়োজন কি? বুদ্ধি একটি দুর্বল যন্ত্রমাত্র, উহা আমাদিগকে শুধু ইন্দ্রিয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিতে পারে। যোগী চান ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির রাজ্যে যাইতে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বুদ্ধিচালনার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এই বিষয় তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং আর তর্ক করেন না মৌন অবলম্বন করেন। তর্ক করিতে গেলে মনের সাম্য নষ্ট হইয়া পড়ে, চিত্তের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; ইহা তাঁহার পক্ষে বিঘ্নমাত্র। এই-সব তর্ক ও যুক্তি শুধু প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়ে। এই তর্কযুক্তির অতীত রাজ্যে উচ্চতর তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে। সমগ্র জীবনটা কেবল

বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় বিবাদ করিবার বা বিতর্কসমিতি লইয়া কাটাইবার জন্য নয়।

ঈশ্বরে কর্মফল-অর্পণ অর্থে কর্মের জন্য নিজে কোনরূপ প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া দুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া শান্তিতে অবস্থান করা বুঝায়।

সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥২॥

ঐ ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন সমাধি-অভ্যাসের সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং ক্লেশজনক বিঘ্নসমুদয় ক্ষীণ করা।

আমরা অনেকেই মনকে আদুরে ছেলের মত করিয়া ফেলিয়াছি। উহা যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকি। এই জন্য সর্বদা ক্রিয়াযোগের অভ্যাস আবশ্যক, যাহাতে মনকে সংযত করিয়া নিজের বশীভূত করা যায়। এই সংযমের অভাব হইতেই যোগের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ও তাহাতেই ক্লেশের উৎপত্তি। এগুলি দূর করিবার উপায়—ক্রিয়াযোগের দ্বারা মনকে বশীভূত করা, মনকে উহার কার্য করিতে না দেওয়া।

অবিদ্যা হস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥৩॥

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (জীবনে আসক্তি) এইগুলিই পঞ্চক্লেশ।

ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ, ইহারা পঞ্চবন্ধনরূপে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে। অবশ্য অবিদ্যাই কারণ এবং অন্য চারটি ফল। অবিদ্যাই আমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ। আর কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে এইরূপ দুঃখ দেয়? আত্মা নিত্য আনন্দস্বরূপ; আত্মার এই সমুদয় দুঃখই কেবল ভ্রমমাত্র।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণম্ ॥৪॥

অবিদ্যাই পরবর্তীগুলির উৎপাদক ক্ষেত্র; এগুলি কখনও লীন (সুপ্ত) ভাবে, কখনও সূক্ষ্মভাবে, কখনও অন্য বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অভিভূত হইয়া থাকে, কখনও বা প্রকাশিত (বিস্তারিত) থাকে।

অবিদ্যাই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের (জীবনে আসক্তির) কারণ। ঐ সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। কখনও ঐগুলি ‘সুপ্ত’ ভাবে থাকে। তোমরা অনেক সময় ‘শিশুতুল্য নিরীহ’ এই বাক্য শুনিয়া থাক, কিন্তু এই শিশুর ভিতরেই হয়তো দেবতা বা অসুরের ভাব রহিয়াছে। ঐ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। যোগীর হৃদয়ে পূর্বকর্মের ফলস্বরূপ ঐ সংস্কারগুলি ‘তনু’ (সূক্ষ্ম)—ভাবে থাকে। ইহার তাৎপর্য এই, ঐগুলি খুব সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে; যোগী ঐগুলি দমন করিয়া রাখিতে পারেন—যাহাতে উহারা ব্যক্ত হইতে না পায়। ‘বিচ্ছিন্ন’ অবস্থায় কতকগুলি প্রবল সংস্কার অন্য কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের

জন্য অভিভূত বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কিন্তু যখনই ঐ কারণগুলি চলিয়া যায়, তখনই আবার অন্য সংস্কারগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই শেষ অবস্থাটির নাম 'উদার' (বিস্তৃত)। ঐ অবস্থায় সংস্কারগুলি অনুকূল পরিবেশ পাইয়া শুভ বা অশুভরূপে প্রবলভাবে কার্য করিতে থাকে।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥৫॥

অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে 'অবিদ্যা' বলে।

এই সমুদয় সংস্কারের একমাত্র কারণ অবিদ্যা। আমাদের প্রথমে জানিতে হইবে, এই অবিদ্যা কি। আমরা সকলেই মনে করি, 'আমি শরীর; শুদ্ধ জ্যোতির্ময় নিত্যআনন্দস্বরূপ আত্মা নই'—ইহাই অবিদ্যা। আমরা মানুষকে শরীর বলিয়াই ভাবি এবং সেই ভাবেই দেখি, ইহা মহা ভ্রম।

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবা হস্মিতা ॥৬॥

দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই অস্মিতা।

আত্মাই যথার্থ 'দ্রষ্টা', তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্র, অনন্ত ও অমর। আর 'দর্শনশক্তি' অর্থাৎ উহার ব্যবহার্য যন্ত্র কি কি? চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি মন ও ইন্দ্রিয়গণ—এইগুলি আত্মার যন্ত্র। এইগুলি

তাঁহার বাহ্য জগৎ দেখিবার যন্ত্রস্বরূপ, আর আত্মার সহিত ঐগুলির একীভাবকে অস্মিতারূপ অবিদ্যা বলে। আমরা বলিয়া থাকি, 'আমি চিত্ত', 'আমি চিন্তা', 'আমি রুষ্ট হইয়াছি', অথবা 'আমি সুখী'। কিন্তু কিরূপে আমরা রুষ্ট হইতে পারি বা কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি? আত্মার সহিত নিজেকে অভেদ জানিতে হইবে। আত্মার তো কখনও পরিণাম হয় না। আত্মা যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে কখনও সুখী, কখনও দুঃখী হইতে পারেন? তিনি নিরাকার, অনন্ত ও সর্বব্যাপী। কে তাঁহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে? আত্মা সর্ববিধ নিয়মের অতীত। কে তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে? জগতের কোন কিছুই আত্মার উপর কোন কার্য করিতে পারে না। তথাপি আমরা অজ্ঞতাবশতঃ নিজদিগকে মনোবৃত্তির সহিত একীভূত করিয়া ফেলি এবং সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছি মনে করি।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥৭॥

যে মনোবৃত্তি কেবল সুখকর পদার্থের উপর থাকিতে চায়, তাহাকে রাগ বলে।

আমরা কোন কোন বিষয় সুখ পাইয়া থাকি; যে-সব বিষয়ে আমরা সুখ পাই, সেগুলির দিকে মন একটি প্রবাহের মত প্রবাহিত হইতে থাকে। সুখ-কেন্দ্রের দিকে ধাবমান আমাদের মনের ঐ প্রবাহকেই

‘রাগ বা আসক্তি’ বলে। আমরা যাহাতে সুখ পাই না, এমন কোন বিষয়ে আমরা কখনই আকৃষ্ট হই না। অনেক সময়ে আমরা নানা প্রকার অদ্ভুত বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেল, তাহা সর্বত্রই খাটে। আমরা যেখানে সুখ পাই, সেখানেই আকৃষ্ট হই।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ॥৮॥

দুঃখকর পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ স্থিতিশীল অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষকে দ্বেষ বলে।

যাহাতে আমরা দুঃখ পাই, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাই।

স্বরসবাহী বিদুষো হপি তথারূঢ়ো হভিনিবেশঃ ॥৯॥

যাহা পূর্ব পূর্ব মরণানুভব হইতে স্বভাবতঃ প্রবাহিত ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা।

এই জীবনের প্রতি মমতা প্রত্যেক জীবেই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর পরজন্ম-সম্বন্ধীয় মত স্থাপন করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে, মানুষ জীবনকে এত বেশী ভালবাসে বলিয়া ভবিষ্যতেও সে একটি জীবন আকাঙ্ক্ষা করে। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই। তবে ইহার মধ্যে

সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্যদেশসমূহের মতে এই জীবনের প্রতি মমতা হইতে যে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাব্যতা সূচিত হয়, তাহা কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, অন্যান্য জন্তুর পক্ষে নয়। ভারতবর্ষে—জীবনের এই মমতাই পূর্বসংস্কার ও পূর্বজীবন প্রমাণ করিবার অন্যতম যুক্তিস্বরূপ হইয়াছে। মনে কর, যদি সমুদয় জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় যে, আমরা যাহা কখনও প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখনও কল্পনাও করিতে পারি না বা বুঝিতেও পারি না। কুক্কুটশাবকগণ ডিম্ব হইতে ফুটিবামাত্র খাইতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যখন কুক্কুটী দ্বারা হংসডিম্ব ফুটান হইয়াছে, তখন হংসশাবক ডিম্ব হইতে বাহির হইবামাত্র জলের দিকে চলিয়া গিয়াছে; কুক্কুটিমাতা মনে করে, শাবকটি বুঝি জলে ডুবিয়া গেল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে কুক্কুটশাবকগুলি কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিতে শিখিল অথবা ঐ হংসশাবকগুলি কোথায় শিখিল জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান? যদি বল, ইহা সহজাত জ্ঞান (instinct), তবে তো কিছুই বুঝা গেল না—কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ করা হইল, ব্যাখ্যা কিছুই হইল না। এই সহজাত জ্ঞান কি? এইরূপ সহজাত জ্ঞান আমাদেরও অনেক আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন; আপনাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, যখন আপনারা প্রথম

শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তখন আপনাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দায় একটির পর আর একটিতে কত যত্নের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু বহু বৎসরের অভ্যাসের পর এখন আপনারা হয়তো কোন বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর উপর আঙ্গুলগুলি আপনা-আপনি চলিতে থাকিবে। উহা এখন আপনাদের সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য যে-সব কাজ আমরা করিয়া থাকি, সেগুলি সম্বন্ধেও ঐরূপ। অভ্যাসের দ্বারা কোন কাজ স্বাভাবিক হইয়া যায়, স্বয়ংক্রিয় হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, এখন যে ক্রিয়াগুলিকে স্বভাবজ বলি, সেগুলি পূর্বে বিচার-সহিত করিতে হইত, এখন স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদের ভাষায় সহজাত জ্ঞান যুক্তি-বিচারের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা মাত্র। বিচার-জনিত জ্ঞান সঙ্কুচিত হইয়া স্বাভাবিক সহজাত জ্ঞান বা সংস্কারে পরিণত হয়। অতএব আমরা যাহাকে সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা যে বিচারজনিত জ্ঞানের সঙ্কুচিত অবস্থা মাত্র, এরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত যুক্তিবিচার সম্ভব নয়, সুতরাং সমুদয় সহজাত জ্ঞানই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। কুক্কুটগণ শ্যেনকে ভয় করে, হংসশাবকগণ জল ভালবাসে, এ-দুইটিই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। এখন প্রশ্নঃ এই অনুভূতি—জীবাত্মার অথবা কেবল শরীরের? হংস এখন যাহা অনুভব করিতেছে, তাহা কেবল ঐ হংসের পূর্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতা হইতে আসিতেছে, না উহা হংসের

নিজের অভিজ্ঞতা? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উহা কেবল তাহার শরীরের ধর্ম। কিন্তু যোগীরা বলেন, উহা মনের অনুভূতি— শরীরের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে মাত্র। ইহাকেই পুনর্জন্মবাদ বলে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—আমাদের সমুদয় জ্ঞান, যেগুলিকে প্রত্যক্ষ, বিচারজনিত বা সহজাত জ্ঞান বলি, সে-সবই জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই আসিতে পারে; আর যাহাকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল, উহাই এখন নিম্নস্তরে নামিয়া সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচারজনিত জ্ঞানে উন্নীত হইয়া থাকে। সমুদয় জগতেই এই ব্যাপার চলিতেছে। ইহার উপরেই ভারতের পুনর্জন্মবাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি স্থাপিত হইয়াছে। পুনঃপুনঃ অনুভূত নানাবিধ ভয়ের সংস্কার কালক্রমে জীবনের প্রতি এই মমতায় পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিকভাবে ভয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার মনে দুঃখযন্ত্রণার পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা জানেন, এই শরীর চলিয়া যাইবে, যাঁহারা বলেন, 'ভয় নাই, চিন্তা নাই; আমাদের শত শত শরীর হইয়া গিয়াছে, আত্মা কখনও মরে না', তাঁহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণা সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে আমরা এই জীবনের প্রতি আসক্তি দেখিতে পাই। কেন এই জীবনের প্রতি আসক্তি? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা

আমাদের সহজাত বা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উহা 'সংস্কার'-এ পরিণত হইয়াছে, বলা যায়। এই সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম বা গুপ্তভাবে চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। পূর্বমৃত্যুর এই-সব অভিজ্ঞতা, যেগুলিকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, সেগুলি অবচেতন-ভূমিতে উপনীত হইয়াছে। ঐগুলি চিত্তেই বাস করে; এগুলি নিষ্ক্রিয় নয়, মনের গভীরতর প্রদেশে থাকিয়া কাজ করিয়া চলে।

এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে অর্থাৎ যেগুলি স্থূলভাবে প্রকাশিত, সেগুলিকে আমরা বেশ বুঝিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি; ঐগুলিকে দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এই সূক্ষ্মতর সংস্কারগুলির সম্বন্ধে কি করা যায়? ঐগুলি দমন করা যায় কিরূপে? যখন আমি রুষ্ট হই, তখন আমার সমুদয় মনটি যেন ক্রোধের এক বিরাট তরঙ্গাকার ধারণ করে। আমি উহা অনুভব করিতে পারি, উহাকে যেন হাতে করিয়া নাড়িতে পারি, উহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারি, কিন্তু আমি যদি মনের অতি গভীরে উহার কারণে যাইতে না পারি, তবে কখনই আমি উহাকে জয় করিতে সমর্থ হইব না। কোন লোক আমাকে খুব কড়া কথা বলিল, আমারও বোধ হইতে লাগিল যে, আমি উত্তেজিত হইতেছি, সে আরও কড়া কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, আত্মবিস্মৃত হইলাম, ক্রোধবৃত্তির সহিত যেন নিজেকে মিশাইয়া ফেলিলাম। যখন সে আমাকে প্রথমে কটু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও

আমার বোধ হইতেছিল—আমি যেন ক্রুদ্ধ হইতেছি। তখন ক্রোধ একটি ও আমি একটি, পৃথক্ পৃথক্ ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, তখন আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হইয়া গেলাম। ঐ বৃত্তিগুলিকে মূলে বীজভাবেই সূক্ষ্মাবস্থাতেই সংযত করিতে হইবে। ঐগুলি আমাদের উপর ক্রিয়া করিতেছে—আমরা ইহা বুঝিবার পূর্বেই ঐগুলিকে সংযত করিতে হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মাবস্থার অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত নয়। যে অবস্থায় ঐ বৃত্তিগুলি অবচেতনভূমি হইতে একটু একটু করিয়া উদিত হয়, তাহাকেই বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা বলা যায়। যখন কোন হ্রদের তলদেশ হইতে একটি বুদ্বুদ উত্থিত হয়, তখন আমরা উহাকে দেখিতে পাই না; শুধু তাহা নয়, উপরিভাগের খুব নিকটে আসিলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না; যখনই উহা উপরে উঠিয়া মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করে, তখনই জানিতে পারি—একটি তরঙ্গ উঠিতেছে। যখন আমরা সূক্ষ্মাবস্থাতেই তরঙ্গগুলিকে ধরিতে পারিবে, তখনই ঐগুলিকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইব। এইরূপে স্থূলভাবে পরিণত হইবার পূর্বেই সূক্ষ্মাবস্থায় ঐ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি যত দিন না আমরা সংযত করিতে পারি, ততদিন আমাদের কোন বৃত্তিই পূর্ণভাবে জয় করার আশা নাই। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে হইলে ঐগুলিকে মূলে সংযত করিতে হইবে। কেবল তখনই আমরা বৃত্তিগুলির বীজ পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব;

যেমন ভর্জিত বীজ মৃত্তিকায় ছাড়াইয়া দিলে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি এই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি আর উদিত হইবে না।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মা ॥১০॥

সেই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণাম দ্বারা (কার্যকে কারণে পরিণত করিয়া) নাশ করিতে হয়।

ধ্যানের দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি নষ্ট হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে সূক্ষ্মসংস্কার বা বাসনা বলে। উহা নাশ করিবার উপায় কি? উহাকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোমপরিণামের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। প্রতিলোম-পরিণাম অর্থ—কার্যের কারণে লয়। চিত্তরূপ কার্য যখন সমাধিদ্বারা অস্মিতা বা অহঙ্কার-রূপ স্বকারণে লীন হইবে তখনই চিত্তের সহিত সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিও নষ্ট হইয়া যাইবে। ধ্যানের দ্বারা এগুলি নষ্ট করা যায় না।

ধ্যানহেয়াস্তদ্ বৃত্তয়ঃ ॥১১॥

ধ্যানের দ্বারা উহাদের স্থূলাবস্থা নাশ করিতে হয়।

ধ্যানই এই বৃহৎ তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ করিবার এক প্রধান উপায়। ধ্যানের দ্বারাই মন বৃত্তিরূপ তরঙ্গগুলি প্রশমিত করিতে পারে। যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ধ্যান অভ্যাস কর, যতদিন না উহা তোমার অভ্যাসে

পরিণত হয়, যতদিন না ঐ ধ্যান আপনা হইতেই আসে, ততদিন যদি এরূপ কর, তাহা হইলে ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হইবে, সংযত হইবে।

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥১২॥

কর্মের আশয় বা আধারের মূল এই পূর্বোক্ত ক্লেশগুলি; বর্তমান অথবা পর-জীবনে উহারা ফল প্রসব করে।

কর্মাশয়ের অর্থ এই সংস্কারগুলির সমষ্টি। আমরা যে-কোন কাজ করি না কেন, অমনি মনোহ্রদে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়। আমরা মনে করি কাজটি শেষ হইয়া গেলেই তরঙ্গটিও শেষ হইয়া গেল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। উহা সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, ঐ স্থানেই রহিয়াছে। যখন আমরা ঐ কার্যের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহা পুনর্বার উদিত হইয়া আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয়। অতএব উহা মনের ভিতরই গূঢ়ভাবে ছিল; যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি অসম্ভব হইত। সুতরাং প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করে এবং ঐ স্থানেই সঞ্চিত থাকে; সুখকর অথবা দুঃখকর—সকল প্রকার চিন্তাকেই ‘ক্লেশ’-জনক বাধা বলে, কারণ যোগীদের মতে উভয়েই পরিণামে দুঃখ প্রসব করে। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে যে-সব সুখ পাওয়া যায়,

পরিণামে সেগুলি দুঃখ আনিবে। ভোগে ভোগতৃষ্ণা বাড়িতেই থাকে, তাহার ফল দুঃখ। মানুষের বাসনার অন্ত নাই, মানুষ ক্রমাগত বাসনা করিতেছে; বাসনা করিতে করিতে যখন সে এমন স্থানে উপনীত হয় যে, কোনমতে তাহার বাসনা আর পূর্ণ হয় না, তখনই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই যোগীরা শুভ ও অশুভ সংস্কারসমষ্টিকে 'ক্লেশ' বলিয়া থাকেন, এগুলি আত্মার মুক্তিপথে বাধা দেয়।

সকল কার্যের সূক্ষ্মমূলস্বরূপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে; তাহারা কারণস্বরূপ হইয়া ইহজীবনে বা পরজীবনে ফল প্রসব করিয়া থাকে (দৃষ্ট-বা অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়)। বিশেষ বিশেষ স্থলে যখন ঐ সংস্কারগুলি খুব প্রবল হয়, তখন শীঘ্রই ফল দান করে; অত্যুৎকট পুণ্য বা পাপকর্ম ইহজীবনেই ফল উৎপন্ন করে। যোগীরা বলেন যে-সকল ব্যক্তি ইহজীবনেই খুব প্রবল শুভসংস্কার উপার্জন করিতে পারেন, তাঁহাদের মৃত্যু হয় না, তাঁহারা ইহজীবনেই এই দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন। যোগীদের গ্রন্থে এইরূপ কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। ইঁহারা নিজেদের শরীরের উপাদান পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন, দেহের পরমাণুগুলিকে এমন নূতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, তাঁহাদের আর কোন পীড়া হয় না এবং আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাও তাঁহাদের নিকট আসিতে পারে না। এরূপ হইবে না কেন? শারীরবিজ্ঞানে খাদ্যের অর্থ—সূর্য হইতে শক্তিগ্রহণ। ঐ শক্তি

প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে; সেই উদ্ভিদ আবার কোন পশুতে ভোজন করে, মানুষ আবার সেই পশুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, আমরা সূর্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লই। যদি এইরূপ হয়, তবে এই শক্তি আহরণ করিবার একটিমাত্র উপায় থাকিবে কেন? আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, উদ্ভিদের শক্তিসংগ্রহের উপায় ঠিক তাহা নয়; আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, পৃথিবী সেরূপে করে না, কিন্তু তাহা হইলেও সকলেই কোন না কোনরূপে শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। যোগীরা বলেন, তাঁহারা কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন। সাধারণ উপায় অবলম্বন না করিয়াও তাঁহারা যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন। ঊর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তন্তু বিস্তার করিয়া পরিশেষে এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে সেই তন্তু অবলম্বন না করিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আমাদের উপাদান পদার্থ হইতে এই স্নায়ুজাল সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আর সেই স্নায়ুপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া কোন কাজ করিতে পারি না। যোগী বলেন, ইহাতে বদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই।

এই তত্ত্বটি আর একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর যে-কোন দিকে তড়িৎশক্তি প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদিগকে উহা তারের ভিতর দিয়া পাঠাইতে হয়। প্রকৃতি

তো বিনা তারেই বহু পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণ করিতেছে। আমরাই বা কেন তাহা করিতে পারিব না? আমরা চতুর্দিকে মানসতড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমরা যাহাকে মন বলি, তাহা প্রায় তড়িৎশক্তির মত। স্নায়ুর মধ্যে যে এক তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যে কিছু পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি আছে ইহা অতি স্পষ্ট, কারণ তড়িতের ন্যায় উহারও দুই প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয় এবং তড়িতের ধর্মগুলি উহাতে দেখা যায়। এই তড়িৎশক্তিকে এখন আমরা কেবল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারি। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য না লইয়াই বা কেন ইহা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইব না? যোগী বলেন, ইহা খুবই সম্ভব এবং ইহা কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে। আর ইহাতে কৃতকার্য হইলে তুমি সমগ্র জগতে এই শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি কোন স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্য না লইয়াই যেখানে ইচ্ছা যে-কোন শরীরের দ্বারা কার্য করিতে পারিবে। যখন কোন জীবাত্মা এই স্নায়ুপ্রণালীর ভিতর দিয়া কাজ করে, আমরা তখন বলি মানুষটি জীবিত, এবং যখন এই যন্ত্রগুলির দ্বারা কাজ হয় না, তখন বলি মানুষটি মৃত। কিন্তু যখন কেহ এই-সকল স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যে বা স্নায়ু ব্যতীতই কাজ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু—এই দুই শব্দের আর কোন অর্থই নাই। জগতে সব শরীরই তন্মাত্র দ্বারা রচিত, প্রভেদ কেবল বিন্যাসের প্রণালীতে। যদি তুমিই ঐ বিন্যাসের কর্তা হও, তাহা

হইলে তুমি যেরূপে ইচ্ছা, ঐ তন্মাত্রগুলির বিন্যাস করিয়া শরীর রচনা করিতে পার। এই শরীর—তুমি ছাড়া আর কে নির্মাণ করিয়াছে? আহার করে কে? যদি আর একজন তোমার হইয়া আহার করিয়া দিত, তবে তোমাকে আর বেশী দিন বাঁচিতে হইত না। ঐ খাদ্য হইতে রক্তই বা উৎপাদন করে কে? নিশ্চয় তুমি। ঐ রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে? তুমিই। আমরাই দেহের প্রভু এবং উহাতে বাস করিতেছি। দেহ কিভাবে আবার তরুণ করিয়া তোলা যায়, সেই জ্ঞান আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা যন্ত্রতুল্য স্বয়ংক্রিয়—অধনত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা দেহের পরমাণুগুলির বিন্যাসপ্রণালী ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং এখন আমরা যন্ত্রের মত যাহা করিতেছি, তাহা জ্ঞাতসারে করিতে হইবে। আমরাই দেহের প্রভু, সুতরাং আমাদিগকেই সেই বিন্যাসপ্রণালী নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাতে কৃতকার্য হইলেই আমরা ইচ্ছামত দেহকে আবার তরুণ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইব; তখন আমাদের জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু—কিছুই থাকিবে না।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥১৩॥

মনে এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার ফলস্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও সুখদুঃখাদি ভোগ হয়।

মূল অর্থাৎ সংস্কাররূপ কারণগুলি ভিতরে থাকে, তাহারাই ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া ফলরূপে পরিণত হয়। কারণের নাশ হইয়া কার্যের উদয় হয়, আবার কার্য সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া পরবর্তী কার্যের কারণস্বরূপ হয়। বৃক্ষ বীজ প্রসব করে, বীজ আবার পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হয়; এইরূপেই কার্যকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। আমাদের এখানকার কাজকর্ম সবই পূর্বসংস্কারের ফলস্বরূপ। এই কার্যগুলি আবার সংস্কারে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্যের কারণ হইবে; এই ভাবেই চলিতে থাকে। এইজন্যই এই সূত্র বলিতেছে, কারণ থাকিলে তাহার ফল বা কার্য অবশ্যই হইবে। এই ফল প্রথমতঃ 'জাতি'রূপে প্রকাশ পায়; কেহ বা মানুষ হইবে, কেহ দেবতা, কেহ পশু, কেহ বা অসুর হইবে। তারপর এই কর্ম আবার আয়ুকেও নিয়মিত করে। একজন হয়তো পঞ্চাশ বৎসর বাঁচে, আর একজন একশত বৎসর, আবার কেহ হয়তো দুই বৎসর বয়সেই মরিয়া যায়; সে আর পূর্ণবয়স্ক হয় না। জীবনের এই-সব বিভিন্নতা পূর্বকর্মদ্বারাই নিয়মিত হয়। কেহ যেন সুখভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যদি সে বনে গিয়া লুকাইয়া থাকে, সুখ তাহাকে অনুসরণ করিবে। আর একজন যেখানেই যায়, দুঃখ তাহাকে অনুসরণ করে, সবই তাহার নিকট দুঃখময়। এই-সবই তাহাদের নিজ নিজ পূর্বকর্মের ফল। যোগীদিগের মতে পুণ্যকর্ম হইতে সুখ, পাপকর্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি

অসৎ কাজ করে, সে নিশ্চয়ই দুঃখকষ্টরূপে তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করিবে।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥১৪॥

পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়া উহাদের ফল যথাক্রমে আনন্দ ও দুঃখ।

পরিণামতা প-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধা চ্চ

দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ॥১৫॥

কি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে ভোগ-ব্যাঘাতের আশঙ্কায় অথবা সুখ-সংস্কারজনিত নূতন তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং গুণবৃত্তি (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বিবেকীর নিকট সবই যেন দুঃখ বলিয়া বোধ হয়।

যোগীরা বলেন, যাঁহার বিবেকশক্তি আছে, যাঁহার একটু ভিতরের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি সুখ ও দুঃখ নামধেয় সর্ববিধ বস্তুর অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন, আর জানিতে পারেন উহারা সর্বদা সর্বত্র সমভাবে রহিয়াছে। একটির সঙ্গে আর একটি যেন জড়াইয়া, একটি যেন আর একটিতে মিশিয়া আছে। সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, মানুষ সমগ্র জীবন কেবল এক আলেয়ার অনুসরণ করিতেছে; সে কখনই তাহার বাসনাপূরণে সমর্থ হয় না।

এক সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, ‘জীবনে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা এই যে, প্রতি মুহূর্তেই প্রাণিগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও মনে করিতেছি, আমরা কখনই মরিব না।’ চতুর্দিকে মূর্খদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মনে করিতেছি, শুধু আমরাই পণ্ডিত—শুধু আমরাই মূর্খশ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। সর্বপ্রকার চঞ্চলতার অভিজ্ঞতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাসাই একমাত্র স্থায়ী ভালবাসা। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? ভালবাসাও স্বার্থপরতা-মিশ্রিত। যোগী বলেন, ‘পরিণামে দেখিতে পাইবে, এমন কি পতিপত্নীর প্রেম, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, বন্ধুদের প্রীতি—সবই অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইয়া আসে।’ এই সংসারে ক্ষয় প্রত্যেক বস্তুকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। যখনই সংসারের সকল বাসনা, এমন কি ভালবাসা পর্যন্ত বিফল হয়, তখনই যেন চকিতের ন্যায় মানুষ বুঝিতে পারে এই জগৎ কিভাবে ব্যর্থ, কতখানি স্বপ্নসদৃশ! তখনই তাহার চোখে বৈরাগ্যের ক্ষণিক আলো দেখা দেয়, তখনই সে অতীন্দ্রিয় সত্তার যেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে ত্যাগ করিলেই জগদতীত তত্ত্বটি হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়; এই জগতের সুখে আসক্ত থাকিলে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এমন কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহাকে এই উচ্চাবস্থা লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সুখভোগ ত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিগুলির পরস্পর বিরোধই দুঃখের কারণ।

একটি মানুষকে একদিকে অপরটি আর একদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥১৬॥

যে দুঃখ এখনও আসে নাই, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

কর্মের কিঞ্চিদংশ আমাদের ভোগ হইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিদংশ আমরা বর্তমানে ভোগ করিতেছি, অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে। আমাদের যাহা ভোগ হইয়া গিয়াছে, তাহা তো চুকিয়া গিয়াছে। আমরা বর্তমানে যাহা ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে, কেবল যে-কার্য ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে, তাহাই আমরা জয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। এই দিকেই আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। এজন্যই পতঞ্জলি বলিয়াছেন (২।১০)-সংস্কারগুলিকে কারণে লয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥১৭॥

এই যে হেয়, অর্থাৎ যে দুঃখকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার কারণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ।

এই দ্রষ্টার অর্থ কি? মানুষের আত্মা—পুরুষ। দৃশ্য কি? মন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্যন্ত সমুদয় প্রকৃতি। এই পুরুষ ও

(প্রকৃতির) মনের সংযোগ হইতে সমুদয় সুখদুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, এই যোগশাস্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ধস্বরূপ; যখনই উহা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সুখ বা দুঃখ অনুভব করে বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্॥১৮॥

'দৃশ্য' বলিতে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। উহা প্রকাশ-ক্রিয়া-ও স্থিতিশীল। উহা দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য।

দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি দ্বারা গঠিত; ভূত বলিতে স্থূল, সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্দ্রিয় অর্থে চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকেও বুঝাইবে। উহাদের ধর্ম বা গুণ আবার তিন প্রকার, যথা—প্রকাশ, কার্য ও জড়তা। ইহাদিগকেই অন্য ভাষায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বলে। সমুদয় প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—যাহাতে পুরুষ সমুদয় ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন। পুরুষ যেন আপনার মহান্ ঐশ্বরিক ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন; এ-বিষয়ে একটি বড় সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র শূকর হইয়া কর্দমের ভিতর বাস করিতেন, তাঁহার অবশ্য একটি শূকরী ছিল, সেই শূকরী হইতে তাঁহার অনেকগুলি শাবক হইয়াছিল। দেবতারা তাঁহার দুরবস্থা দর্শন

করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ‘আপনি দেবরাজ, দেবতারা আপনার শাসনে বাস করেন; আপনি এখানে কেন?’ ইন্দ্র উত্তর দিলেন, ‘আমি বেশ আছি, কিছু ভাবিও না; এই শূকরী ও শাবকগুলি যতদিন আছে, ততদিন স্বর্গাদি কিছুই প্রার্থনা করি না।’ তখন সেই দেবগণ কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে তাঁহারা স্থির করিলেন, একে একে শাবকগুলি সব মারিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে একটি একটি করিয়া শাবকগুলি সব নিহত হইলে দেবগণ অবশেষে সেই শূকরীকেও মারিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; দেবতারা ইন্দ্রের শূকরদেহটি চিরিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র সেই শূকরদেহ হইতে নির্গত হইয়া হাসিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, ‘কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! আমি দেবরাজ, আমি এই শূকরজন্মকেই একমাত্র জন্ম বলিয়া মনে করিতেছিলাম; শুধু তাই নয়; সমগ্র জগৎ শূকরদেহ ধারণ করুক, —আমি এইরূপ ইচ্ছাও করিতেছিলাম।’ পুরুষও এইভাবে প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া বিস্মৃত হন যে, তিনি শুদ্ধস্বভাব ও অনন্তস্বরূপ। পুরুষকে ‘অস্তিত্ববান্’ বলিতে পারা যায় না, কারণ পুরুষ স্বয়ং অস্তিত্বস্বরূপ। পুরুষ বা আত্মাকে ‘জ্ঞানী’ বলিতে পারা যায় না, কারণ আত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাকে ‘প্রেমসম্পন্ন’ বলিতে পারা যায় না, কারণ তিনি স্বয়ং প্রেমস্বরূপ। আত্মা অস্তিত্ববান্, জ্ঞানযুক্ত অথবা প্রেমময়—এরূপ বলা ভুল। প্রেম, জ্ঞান

ও অস্তিত্ব পুরুষের গুণ নয়, ঐগুলি তাঁহার স্বরূপ। যখন ঐগুলি কোন বস্তুর উপর প্রতিবিম্বিত হয়, তখন ঐগুলিকে সেই বস্তুর গুণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু এগুলি পুরুষের গুণ নয়, এগুলি সেই মহান্ আত্মার—অনন্ত পুরুষের স্বরূপ—তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তিনি স্বরূপ ভুলিয়া এতদূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, যদি তুমি তাঁহার নিকট গিয়া বল, 'তুমি শূকর নও', তিনি চীৎকার করিতে থাকিবেন ও তোমাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিবেন।

মায়ার মধ্যে—এই স্বপ্নময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। এখানে কেবল রোদন, কেবল দুঃখ, কেবল হাহাকার—এখানে কয়েকটি সুবর্ণগোলক গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে আর সমুদয় জগৎ উহা পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। তুমি কোন নিয়মেই কখনও বদ্ধ ছিলে না। প্রকৃতির বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই। যোগী তোমাকে ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন, ধৈর্যের সহিত ইহা শিক্ষা কর। যোগী তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, কিরূপে—এই প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া, মন ও জগতের সহিত এক করিয়া ফেলিয়া পুরুষ নিজেকে দুঃখী ভাবিতেছেন। যোগী আরও বলেন, এই দুঃখময় সংসার হইতে অব্যাহিত পাইবার উপায় অভিজ্ঞতা-অর্জনের মধ্য দিয়া। অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে নিশ্চয়ই, তবে যত শীঘ্র উহা শেষ করিয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল। আমরা নিজেদের এই জালে ফেলিয়াছি, আমাদিগকে ইহার বাহিরে

যাইতে হইবে। আমরা নিজেরা এই ফাঁদে পা দিয়াছি, নিজ চেষ্টাতেই আমাদিগকে ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। অতএব এই পতিপত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি ও অন্যান্য যেসকল ছোটখাট স্নেহ-ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা আছে, সবই ভোগ করিয়া লও। যদি নিজের স্বরূপ সর্বদা স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্রই নির্বিঘ্নে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। কখনও ভুলিও না—এই অবস্থা অতি অল্পক্ষণের জন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। অভিজ্ঞতাই—আমাদের একমাত্র মহান্ শিক্ষক, কিন্তু ঐ সুখদুঃখগুলিকে কেবল সাময়িক অভিজ্ঞতা বলিয়াই যেন মনে থাকে। এগুলি ধাপে ধাপে আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় বস্তু অতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে, পুরুষ তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত হইবেন, সমুদয় জগৎ তখন যেন সমুদ্রে একবিন্দু জলের মত মনে হইবে, এবং উহা আপনিই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমাদিগকে যাইতেই হইবে, কিন্তু আমরা যেন আমাদের চরম লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত না হই।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥১৯॥

গুণের এই কয়েকটি অবস্থা আছে, যথা—বিশেষ, অবিশেষ, চিহ্নমাত্র (মহৎ) ও চিহ্ন-শূন্য (প্রকৃতি)।

আমি আপনাদিগকে পূর্ব পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, যোগশাস্ত্র সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত; এখানেও পুনর্বার সাংখ্যদর্শনের জগৎসৃষ্টি-প্রকরণ আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—দুই-ই। এই প্রকৃতিতে আবার ত্রিবিধ উপাদান আছে, যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমঃ উপাদানটি অন্ধকার, যাহা কিছু অজ্ঞানাত্মক ও গুরু পদার্থ সবই তমোময়। রজঃ ক্রিয়াশক্তি। সত্ত্ব শান্তভাব—প্রকাশস্বভাব। সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকে, তাহাকে বলে 'অব্যক্ত'—অবিশেষ বা অবিভক্ত; ইহার অর্থ—যে অবস্থায় নামরূপের বিভাগ নাই, যে অবস্থায় ঐ তিনটি পদার্থ ঠিক সাম্যভাবে থাকে। তারপর ঐ সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, এই তিন উপাদান বিবিধভাবে পরস্পর মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহার ফল এই জগৎ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই তিনটি উপাদান বিরাজমান। যখন সত্ত্ব প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের উদয় হয়; রজঃ প্রবল হইলে ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, আবার তমঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, আলস্য ও অজ্ঞান আমাদের আচ্ছন্ন করে। সাংখ্যমতানুসারে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ 'মহৎ' অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব—উহাকে সমষ্টি-বুদ্ধি বলা যায়, ব্যষ্টি মনুষ্যবুদ্ধি উহারই একটি অংশমাত্র। সাংখ্য মনোবিজ্ঞানে 'মন' ও 'বুদ্ধি'র মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। মনের কার্য কেবল বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যষ্টি মহতের সমীপে উপনীত করা। বুদ্ধি ঐ-সকল বিষয় নিশ্চয় করে।

মহৎ হইতে অহংতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তি হয়। এই সূক্ষ্মভূতসকল আবার পরস্পর মিলিত হইয়া এই বাহ্য স্থূলভূতরূপে পরিণত হয়; তাহা হইতেই এই স্থূল জগতের উৎপত্তি; সাংখ্যদর্শনের মত—বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া একখণ্ড প্রস্তর পর্যন্ত সবই এক উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা লইয়াই উহাদের প্রভেদ। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমুদয় প্রকৃতির বাহিরে—তিনি জড় নন; বুদ্ধি, মন, তন্মাত্র অথবা স্থূলভূত কোন কিছুর সদৃশ নন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক্, ইঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্যই মৃত্যুরহিত, কারণ তিনি কোন প্রকার মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নন। যাহা মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখনও নাশ হইতে পারে না। এই পুরুষ বা আত্মা-সমূহের সংখ্যা অসীম।

এখন আমরা এই সূত্রটির তাৎপর্য বুঝিতে পারিব। 'বিশেষ' অর্থে স্থূলভূত—যেগুলিকে আমরা। ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। 'অবিশেষ' অর্থে সূক্ষ্মভূত—তন্মাত্র, এই তন্মাত্র সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে না। পতঞ্জলি বলেন, 'যদি তুমি যোগাভ্যাস কর, কিছুদিন পরে তোমার অনুভব-শক্তি এত সূক্ষ্ম হইবে যে, তুমি তন্মাত্রগুলি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে।' তোমরা শুনিয়াছ, প্রত্যেক ব্যক্তির চারিদিকে এক প্রকার জ্যোতিঃ আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্বদা এক প্রকার আলোক বাহির হইতেছে।

পতঞ্জলি বলেন, কেবল যোগীই উহা দেখিতে পান। আমরা সকলে উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু যেমন পুষ্প হইতে সর্বদাই সূক্ষ্মকণা নির্গত হয়, যেগুলি দ্বারা আমরা আঘ্রাণ পাই, সেইরূপ আমাদের শরীর হইতেও সর্বদাই এই তন্মাত্রসকল বাহির হইতেছে। প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে শুভ বা অশুভ শক্তি ও ভাবরাশি বাহির হইতেছে; এবং আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই পরিবেশ এই তন্মাত্রয় পূর্ণ থাকে। ইহার প্রকৃত রহস্য না জানিলেও এইভাবেই অজ্ঞাতসারে মানুষের মনে মন্দির, গীর্জাদি করিবার ভাব আসিয়াছে। ভগবান্‌কে উপাসনা করিবার জন্য মন্দিরনির্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা কর না কেন? কারণ না জানিলেও মানুষ বুঝিয়াছিল যে, যেখানে লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সকলে প্রত্যহ সেখানে যায়, সেখানে যতই বেশী যাতায়াত করে, ততই মানুষ পবিত্র হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটিও পবিত্রতর হইতে থাকে। যে ব্যক্তির অন্তরে বেশী সত্ত্বগুণ নাই, সে যদি সেখানে যায়, তাহারও সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইবে। অতএব মন্দির ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এটি সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধু লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষ মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়—অশ্বের সম্মুখে শকট যোজনা করে। প্রথমে মানুষই এই স্থানগুলিকে পবিত্র

করিয়াছে, তারপর সেই স্থানের পবিত্রতা আবার কারণ হইয়া অপরকেও পবিত্র করিত। যদি সে স্থানে সর্বদা অসাধু লোকই যাতায়াত করে, তাহা হইলে সেই স্থান অন্যান্য স্থানের মতই অপবিত্র হইয়া যাইবে। বাড়ীঘরের গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু এটি আমরা সর্বদা ভুলিয়া যাই। এই কারণেই সমধিক সত্ত্বগুণসম্পন্ন সাধু ও মহাত্মাগণ চতুর্দিকে ঐ সত্ত্বগুণ বিকিরণ করিয়া তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের উপর দিনরাত প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মানুষ এত পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন স্পর্শ করা যায়। সাধুর শরীর পবিত্র, তিনি যেখানে বিচরণ করেন, সেখানেই পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হয়। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসে, সে-ই পবিত্র হইয়া যায়।

এখন 'লিঙ্গমাত্র'-এর অর্থ কি, দেখা যাক। 'লিঙ্গমাত্র' বলিতে বুদ্ধিকে বুঝায়; উহা প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহা হইতেই অন্যান্য সমুদয় বস্তু অভিব্যক্ত হইয়াছে। গুণের শেষ অবস্থাটির নাম 'অলিঙ্গ' বা চিহ্নশূন্য। এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্মেই এই ভাবটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জগৎ চৈতন্যশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষ কিনা, এ বিচার ছাড়িয়া দিয়া কেবল মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া ধরিলে ঈশ্বরবাদের তাৎপর্য এই যে, চৈতন্যই সৃষ্টির আদি বস্তু; তাহা হইতেই

স্থূলভূতের প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, চৈতন্য সৃষ্টির শেষ বস্তু। তাঁহাদের মত এই যে, অচেতন জড় বস্তুসকল অল্পে অল্পে জীবজন্তুতে পরিণত হইয়াছে, এই জীবজন্তু ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মনুষ্যরূপে বিকশিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, জগতে সমুদয় বস্তু যে চৈতন্য হইতে প্রসূত হইয়াছে তাহা নয়, বরং চৈতন্যই সৃষ্টির সর্বশেষ বস্তু। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও দুইটি সিদ্ধান্তই সত্য। একটি অনন্ত শৃঙ্খল বা শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-খ-ক-খ-ক-খ-ইত্যাদি; প্রশ্ন এই, ইহার মধ্যে ক আদিতে অথবা খ আদিতে? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক-খ এইরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে অবশ্য 'ক' কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্তু যদি তুমি উহাকে খ-ক এইভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে 'খ' কেই আদি ধরিতে হইবে। আমরা যে দিক দিয়া দেখিতেছি, তাহার উপর উহা নির্ভর করে। চৈতন্য পরিণামপ্রাপ্ত ইহয়া স্থূলভূতের আকার ধারণ করে, স্থূলভূত আবার চৈতন্যরূপে পরিণত হয়, এইভাবেই চলিতে থাকে। সাংখ্যেরা ও অন্যান্য ধর্মাচার্যগণ চৈতন্যকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে ঐ শৃঙ্খল এই আকার ধারণ করে, যথা—প্রথমে চৈতন্য, পরে জড়। বৈজ্ঞানিক জড়কে গ্রহণ করিয়া বলেন, 'প্রথমে জড়, পরে চৈতন্য'। উভয়েই একই শৃঙ্খলের কথা বলিতেছেন। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এই চৈতন্য ও জড়—উভয়েরই পারে পুরুষ বা

আত্মাকে দেখিতে পান। এই আত্মা বুদ্ধির অতীত; বুদ্ধি তাঁহারই প্রতিফলিত আলোক।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশাঃ ॥২০॥

দ্রষ্টা কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি স্বয়ং পবিত্রস্বরূপ, তথাপি বুদ্ধির ভিতর দিয়া তিনি দেখিয়া থাকেন।

এখানেও সাংখ্যদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের এই মত যে, নিম্নতম বিকাশ হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত; পুরুষগণ প্রকৃতির বাহিরে, এই পুরুষগণের কোন গুণ নাই। তবে আত্মা দুঃখী বা সুখী বলিয়া প্রতীয়মান হন কেন? প্রতিফলনের দ্বারা। একখণ্ড স্ফটিকের নিকট একটি লাল ফুল রাখিলে ঐ স্ফটিকটিকে লাল দেখাইবে; সেইরূপ আমরা যে সুখ বা দুঃখ বোধ করিতেছি, তাহা বাস্তবিক প্রতিবিম্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে এ-সকল কিছুই নাই। আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। প্রকৃতি এক বস্তু, আত্মা এক বস্তু, এই দুই চিরদিন পৃথক্। সাংখ্যেরা বলেন যে, (বুদ্ধিজাত) জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ, উহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে, উহা পরিবর্তনশীল; শরীরের ন্যায় উহাও ক্রমশঃ পরিণামপ্রাপ্ত হয়, শরীরের যে-সকল ধর্ম, উহাতেও প্রায় সে-সকল ধর্ম বিদ্যমান। শরীরের পক্ষে নখ যেমন, এই জ্ঞানের পক্ষে দেহও সেইরূপ। নখ শরীরের একটি অংশ,

উহাকে শত শত বার কাটিয়া ফেলিলেও শরীর বাঁচিয়া থাকে। সেইরূপ এই শরীর বহুবার পরিত্যক্ত হইলেও (বুদ্ধিজাত) জ্ঞান যুগযুগান্তর ধরিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জ্ঞান কখনও অবিনাশী হইতে পারে না, কারণ উহা পরিবর্তনশীল, উহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে। আর যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা কখনও অবিনাশী হইতে পারে না। এই জ্ঞান অবশ্যই জন্যপদার্থ। আর ইহা হইতেই বুঝাইতেছে, অন্য আর এক পদার্থ আছে। জন্যপদার্থ কখনও মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং চিরকালের জন্য বদ্ধ। তবে মুক্ত কে? যিনি কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তিনিই প্রকৃত মুক্ত। তুমি যদি বল, মুক্তভাবটি ভ্রমাত্মক, আমি বলিব, বন্ধনের ভাবটিও ভ্রমাত্মক। আমাদের জ্ঞানে এই দুই ভাবই সদা বিরাজিত, পরস্পরের আশ্রিত—একটি না থাকিলে অপরটি থাকিতে পারে না। বন্ধন ও মুক্তি সম্বন্ধে ইহাই আমাদের ধারণা। যদি দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাইতে চাই, আমাদের মাথা দেওয়ালে ধাক্কা খায়; তাহা হইলে বুঝিলাম, আমরা ঐ দেওয়ালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলাম, আমাদের একটা ইচ্ছাশক্তি আছে। এবং মনে করি, এই ইচ্ছাশক্তিকে আমরা যেখানে ইচ্ছা পরিচালিত করিতে পারি। প্রতিপদে এই বিরোধী ভাব-দুইটি আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে আমরা মুক্ত; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দেখিতেছি, আমরা মুক্ত নই। দুইটি ভাবের মধ্যে একটি যদি ভ্রমাত্মক হয়, তবে

অপরটিও ভ্রমাত্মক হইবে, আর একটি যদি সত্য হয় তবে অপরটিও সত্য হইবে, কারণ উভয়েই অনুভবরূপ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। যোগী বলেন, এই দুইটি ভাবই সত্য, বুদ্ধি পর্যন্ত ধরিলে আমরা বদ্ধ। কিন্তু আত্মা হিসাবে আমরা মুক্ত। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা বা পুরুষ—কার্যকারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে। এই আত্মার মুক্তস্বভাবটি জড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া পরিস্রুত হইয়া বুদ্ধি, মন ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে। আত্মারই জ্যোতিঃ সবকিছুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। বুদ্ধির নিজের কোন আলো নাই। মস্তিষ্কে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক-একটি কেন্দ্র আছে। সকল ইন্দ্রিয়ের যে একটিমাত্র কেন্দ্র, তাহা নয়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র পৃথক্ পৃথক্। তবে আমাদের এই অনুভূতিগুলি সামঞ্জস্য লাভ করে কিভাবে? কোথায় তাহারা একত্ব লাভ করে? মস্তিষ্কে যদি তাহারা এই একত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির একটি মাত্র কেন্দ্র থাকিত। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আছে। মানুষ কিন্তু একই সময়ে দেখিতে ও শুনিতে পায়। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে অবশ্যই একটি একত্ব আছে। বুদ্ধি মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধ—কিন্তু এই বুদ্ধিরও পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। তিনিই একত্বস্বরূপ। তাঁহার নিকট গিয়াই সমুদয় বেদনা ও অনুভূতি মিলিত হয় ও একীভাব ধারণ করে। আত্মাই সেই কেন্দ্র, যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি

মিলিত ও একীভূত হয়। সেই আত্মা মুক্তস্বভাব। এই আত্মার মুক্ত স্বভাবই তোমাকে প্রতি মুহূর্তে বলিতেছে, তুমি মুক্ত। কিন্তু তুমি ভুল করিতেছ। সেই মুক্ত স্বভাবকে প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছ। তুমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, বুদ্ধি মুক্তস্বভাব নয়। তুমি তখন সেই মুক্ত স্বভাব দেহে আরোপ করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেন, তুমি আবার ভুল করিয়াছ। এই জন্যই একই সময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধনের মিশ্রিত অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। যোগী মুক্ত ও বদ্ধ, উভয় অবস্থাই বিশ্লেষণ করেন; এবং তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্ত, জ্ঞানঘন; বুদ্ধিরূপ উপাধির মধ্য দিয়া তিনিই এই সান্ত (সীমাবদ্ধ) জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই হিসাবেই তিনি বদ্ধ।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥২১॥

দৃশ্যের (অর্থাৎ প্রকৃতির) আত্মা (স্বভাব, প্রকৃতি ও তাহার বিভিন্ন আকারে পরিণাম) চিন্ময় পুরুষেরই (ভোগ ও মুক্তির) জন্য।

প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতক্ষণ পুরুষ উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণই তাহার শক্তি প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রের আলোক যেমন তাহার নিজের নয়, প্রতিফলিত—প্রকৃতির শক্তিও তদ্রূপ।

যোগীদের মতে প্রকৃতির সমুদয় অভিব্যক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন; কিন্তু পুরুষকে মুক্ত করা ছাড়া প্রকৃতির নিজের কোন উদ্দেশ্য নাই।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥২২॥

যিনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি (বা অজ্ঞান) নষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় না, কারণ অপরের পক্ষে উহা থাকে।

আত্মা যে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহা জানানোই প্রকৃতির সব কাজের একমাত্র লক্ষ্য। যখন আত্মা ইহা জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি আর তাঁহাকে কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারে না। যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই সমুদয় প্রকৃতি লয় পায়। কিন্তু অনন্ত কোটি আত্মা বা পুরুষ চিরকালই থাকিবে, তাহাদের জন্য প্রকৃতি কার্য করিয়াই যাইবে।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩॥

দৃশ্য ও উহার প্রভু দ্রষ্টার শক্তিদ্বয়ের (ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপ) স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ।

এই সূত্রানুসারে—আত্মা ও প্রকৃতি যখন সংযুক্ত হন, তখনই (এই সংযোগবশতঃ) উভয়ের (যথাক্রমে দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব) দুই শক্তি

প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখনই এই জগৎপ্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। অজ্ঞানই এই সংযোগের হেতু। আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের দুঃখ বা সুখের কারণ —শরীরের সহিত সংযোগ। যদি আমার এই নিশ্চয় জ্ঞান থাকিত যে, আমি শরীর নই, তবে আমার শীত-গ্রীষ্ম বা অন্য কিছুই খেয়াল থাকিত না। এই শরীর একটি সংহতি মাত্র। আমার একটি দেহ আছে, তোমার অন্য একটি দেহ আছে, সূর্যের আবার একটি পৃথক্ দেহ—এরূপ বলা কেবল রূপকথা-মাত্র। সমগ্র জগৎ জড়ের এক মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রের এক বিন্দুর নাম 'তুমি', এক বিন্দুর নাম 'আমি' ও আর এক বিন্দুর নাম 'সূর্য'। আমরা জানি, এই জড়রাশি সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করিতেছে। আজ যাহা সূর্যের উপাদানভূত, কাল তাহা আমাদের শরীরের উপাদানে পরিণত হইতে পারে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥২৪॥

এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান।

আমরা অজ্ঞানবশতঃ এক নির্দিষ্ট শরীরে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া দুঃখের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছি। 'আমি শরীর' এই ধারণা একটি কুসংস্কার মাত্র। এই কুসংস্কারই আমাদিগকে সুখী বা দুঃখী করিতেছে। অজ্ঞান-প্রসূত এই কুসংস্কার হইতে আমরা শীত-উষ্ণ,

সুখ-দুঃখ—এই সব বোধ করিতেছি। আমাদের কর্তব্য, এই সংস্কারকে অতিক্রম করা। কি করিয়া ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে, যোগী তাহা দেখাইয়া দেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের কোন বিশেষ অবস্থায় শরীর দগ্ধ হইলেও মানুষ কোন যন্ত্রণা বোধ করিবে না। তবে মনের এইরূপ আকস্মিক উচ্চাবস্থা হয়তো এক নিমিষের জন্য ঘূর্ণাবর্তের মত আসে, আবার পরক্ষণেই চলিয়া যায়। কিন্তু যদি আমরা এই অবস্থা যোগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাভ করি, তাহা হইলে আমরা স্থায়িভাবে অনুভব করিব—শরীর হইতে আত্মা পৃথক্।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥২৫॥

এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাই হান (অজ্ঞানের পরিত্যাগ), ইহাই দ্রষ্টার কৈবল্যপদে অবস্থিতি বা মুক্তি।

যোগদর্শনের মতে আত্মা অবিদ্যাবশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাই সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাব

ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র। যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। যতদিন না আমরা প্রকৃতির প্রভাব হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে পারি, ততদিন তো আমরা ক্রীতদাস; প্রকৃতি যেমন নির্দেশ দেয়, আমরা সেইভাবে চলিতে বাধ্য হই। যোগী বলেন, যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি জড়কেও বশীভূত করিতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, সুতরাং উহার সহিত সংগ্রাম করা—উহাকে জয় করা—অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কারণে যিনি অন্তঃপ্রকৃতি জয় করিয়াছেন, সমুদয় জগৎ তাঁহার বশীভূত, তাঁহার দাসস্বরূপ। প্রকৃতিকে এইরূপে বশীভূত করিবার উপায় রাজযোগে উপস্থাপিত হইয়াছে। আমরা বাহ্যজগতে যে-সকল শক্তির সহিত পরিচিত, তদপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহকে বশে আনিতে হইবে। এই শরীর মনের একটি বাহ্য আবরণ মাত্র। শরীর ও মন যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তাহা নয়, উহারা শুক্তি ও তাহার কঠিন আবরণের মত। উহারা এক বস্তুরই দুইটি বিভিন্ন অবস্থা। শুক্তির অভ্যন্তরীণ পদার্থটি বাহির হইতে নানাপ্রকার উপাদান গ্রহণ করিয়া ঐ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করে। এইভাবেই মনোনামধেয় এই অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম-শক্তিসমূহও বাহির হইতে স্থূল পদার্থ লইয়া তাহা হইতে এই শরীররূপ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করিতেছে। সুতরাং যদি আমরা অন্তর্জগৎ জয় করিতে পারি, তবে

বাহ্যজগৎ জয় করা খুব সহজ হইয়া পড়ে। আবার এই দুই শক্তি যে পরস্পর বিভিন্ন, তাহা নয়। কতকগুলি শক্তি শারীরিক ও কতকগুলি মানসিক, তাহা নয়। যেমন এই দৃশ্যমান জগৎ সূক্ষ্মজগতের স্থূল প্রকাশ মাত্র, তেমনি বাহ্য শক্তিগুলিও সূক্ষ্ম-শক্তির স্থূল প্রকাশ মাত্র।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥২৬॥

নিরন্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান-নাশের উপায়।

সমুদয় সাধনের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসদ্বিবেক—একটি বিশেষরূপে জানা যে, পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, পুরুষ জড়ও নন, মনও নন; আর উনি প্রকৃতি নন বলিয়া উঁহার কোনরূপ পরিবর্তনও সম্ভব নয়। কেবল প্রকৃতিই সর্বদা পরিণত হইতেছে, সর্বদাই উহার সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ও পুনঃসংশ্লেষ ঘটিতেছে। যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমরা এই বিবেকজ্ঞান লাভ করিব, তখনই অজ্ঞান চলিয়া যাইবে। তখনই পুরুষ স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপিরূপে প্রতিভাত হইবেন।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥২৭॥

তাঁহার (জ্ঞানীর) বিবেকজ্ঞানের সাতটি উচ্চতম স্তর আছে।

যখন এই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন যেন উহা একটির পর আর একটি করিয়া সপ্তস্তরে আসিতে থাকে। যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা আরম্ভ হয়, আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা জ্ঞানলাভ করিতেছি। প্রথমে এইরূপ অবস্থা আসিবে, মনে হইবে —'যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি'; মনে তখন আর কোনরূপ অসন্তোষ থাকিবে না। যতক্ষণ আমাদের জ্ঞানপিপাসা থাকে, ততক্ষণ আমরা ইতস্ততঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। যেখানেই কিছু সত্য পাইব বলিয়া মনে হয়, অমনি সেদিকে ধাবিত হই। সেখানে উহা না পাইলে মনে অশান্তি আসে, আবার অন্য একদিকে সন্ধান করি। যতদিন না অনুভব করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, যতদিন না বোধ করি, কেহই আমাদিগকে সত্যলাভে সাহায্য করিতে পারে না, আমাদের নিজেদের নিজেকে সাহায্য করিতে হইবে, ততদিন সমুদয় সত্যান্বেষণই বৃথা। বিবেক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে আমরা যে সত্যের নিকটবর্তী হইতেছি, তাহার প্রথম এই লক্ষণ প্রকাশ পাইবে যে, ঐ অসন্তোষের ভাব চলিয়া যাইবে। আমাদের নিশ্চিত ধারণা হইবে, আমরা সত্য পাইয়াছি এবং ইহা সত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমরা জানিতে পারিব যে, সত্যস্বরূপ সূর্য উদিত হইতেছেন, আমাদের অজ্ঞান রজনী প্রভাত হইতেছে। তখন সাহসে বুক বাঁধিয়া অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে—যতদিন না সেই পরমপদ লাভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত দুঃখ চলিয়া

যাইবে। বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয়ই তখন আমাদিগকে দুঃখ দিতে পারিবে না। তৃতীয় অবস্থায় আমরা পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিব, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইব। চতুর্থ অবস্থায় বিবেকসহায়ে সমুদয় কর্তব্যের অবসান হইবে। তারপর 'চিত্তবিমুক্তি' অবস্থা আসিবে। আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের বিঘ্নবিপত্তি সব চলিয়া গিয়াছে। যেমন কোন পর্বতের চূড়া হইতে একটি প্রস্তরখণ্ড নিম্নে উপত্যকায় পতিত হইলে আর কখনও উপরে উঠিতে পারে না, সেইরূপ মনের সংগ্রাম ও চঞ্চলতা সব নীচে পড়িয়া যাইবে, আর মনে উঠিবে না। পরবর্তী অবস্থায়—চিত্ত বুঝিতে পারিবে, ইচ্ছামাত্রেই উহা স্বকারণে লীন হইয়া যাইতেছে। অবশেষে দেখিতে পাইব, আমরা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আছি; দেখিব, এতদিন জগতে একাকী আত্মারূপে কেবল আমরাই ছিলাম। মন বা শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। উহারা তো আমাদিগের সহিত কখনই যুক্ত ছিল না। উহারা আপন কাজ করিতেছিল, আমরা অজ্ঞানবশতঃ নিজদিগকে উহাদের সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা একাকী, নিঃসঙ্গ, কেবল, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ও সদানন্দ। আমাদের আত্মা এত পবিত্র ও পূর্ণ যে, আমাদের আর কিছুরই আবশ্যক ছিল না। আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরাই সুখস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাইব, এই জ্ঞান অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা আমাদের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না

হইবে। ইহাই যোগীর চরম অবস্থা; যোগী তখন ধীর ও শান্ত হইয়া যান, আর কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করেন না, আর কখনও অজ্ঞান-মোহে ভ্রান্ত হন না এবং দুঃখ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি জানিতে পারেন, 'আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, নিত্যপূর্ণস্বরূপ ও সর্বশক্তিমান্।'

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥২৮॥

যোগের বিভিন্ন অঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের মলিনতা দূর হইয়া গেলে জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; উহার শেষ সীমা বিবেক-খ্যাতি।

এখন সাধনের কথা বলা হইতেছে। এতক্ষণ যাহা বলা হইতেছিল, তাহা অনেক উচ্চতর ব্যাপার। উহা অনেক দূরে, অনেক ঊর্ধ্বে, কিন্তু উহাই আমাদের আদর্শ। প্রথমতঃ শরীর ও মন সংযত করা আবশ্যক। তখনই পূর্বোক্ত আদর্শের উপলব্ধি স্থায়ী হইতে পারে। আদর্শ কি, তাহা আমরা জানিয়াছি; এখন উহা লাভের জন্য সাধন করিতে হইবে।

যম-নিয়মাসন -প্রাণায়াম -প্রত্যাহার -ধারণা -ধ্যান -সমাধয়ো হষ্টাবঙ্গানি ॥২৯॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গস্বরূপ।

অহিংসা -সত্যাস্তেয় -ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥৩০॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এইগুলিকে 'যম' বলে।

পূর্ণ যোগী হইতে গেলে সাধককে স্ত্রী-পুরুষ-লিঙ্গাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই; তবে লিঙ্গাভিমান দ্বারা নিজেকে অবনমিত করিবে কেন? পরে আমরা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, কেন এই-সকল ভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চৌর্য যেমন অসৎকার্য, পরিগ্রহ অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করাও সেইরূপ অসৎ কর্ম। যিনি অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তাঁহার মন দাতার মন দ্বারা প্রভাবিত হয়, সুতরাং যিনি দান গ্রহণ করেন, তাঁহার পতিত হইবার সম্ভাবনা। অপরের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিলে মনের স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে, আমরা ক্রীতদাসতুল্য হইয়া পড়িতে পারি। অতএব কোন দান গ্রহণ করিও না।

এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥৩১॥

এইগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় (অর্থাৎ সাময়িক কর্তব্য বা উদ্দেশ্য) দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইলে সার্বভৌম (অর্থাৎ সর্বজনীন) মহাব্রত বলিয়া কথিত হয়।

এই সাধনগুলি অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকের পক্ষে জাতি, দেশ অথবা অবস্থা-নির্বিশেষে অনুষ্ঠেয়।

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥৩২॥

বাহ্য ও অন্তঃশৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (মন্ত্রজপ বা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রপাঠ) ও ঈশ্বরোপাসনা এইগুলি 'নিয়ম'।

বাহ্যশৌচ অর্থে শরীরকে পবিত্র রাখা; অশুচি ব্যক্তি কখনও যোগী হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশৌচও আবশ্যক। পূর্বে সমাধিপাদ, ৩৩শ সূত্রে যে ধর্মগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ আসে। অবশ্য বাহ্যশৌচ অপেক্ষা অন্তঃশৌচ অধিকতর প্রয়োজন, কিন্তু উভয়টিরই প্রয়োজনীয়তা আছে; আর অন্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাহ্যশৌচ কোন কাজে আসে না।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৩॥

যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে ঐগুলির বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে।

পূর্বে যে-সকল ধর্মের কথা বলা হইল সেগুলি অভ্যাস করিবার উপায়—মনে বিপরীত প্রকারে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করা; অন্তরে চৌর্যের ভাব আসিলে অচৌর্যের চিন্তা করিতে হইবে। দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইলে উহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা

দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৪॥

পূর্বসূত্রে যে প্রতিপক্ষ-ভাবনার কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রণালী এইরূপঃ বিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসাদি—কৃত, কারিত অথবা অনুমোদিত; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ বা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক আর মধ্যম পরিমাণই হউক, অথবা অধিক পরিমাণই হউক; উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ; এইরূপ ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ-ভাবনা বলে।

আমি নিজে মিথ্যা কথা বলিলে যে পাপ হয়, যদি আমি অপরকে মিথ্যা কথা বলিতে প্রবৃত্ত করি, অথবা অপরে মিথ্যা বলিলে তাহা অনুমোদন করি, তাহাতেও তুল্য পরিমাণ পাপ হয়। মিথ্যা সামান্য

হইলেও উহা মিথ্যা। পর্বতগুহায় বসিয়াও যদি তুমি পাপ চিন্তা করিয়া থাক, যদি কাহারও প্রতি অন্তরে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহাও সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার উপর প্রতিঘাত করিবে, একদিন না একদিন কোন না কোন প্রকার দুঃখের আকারে উহা প্রবলবেগে তোমাকে আক্রমণ করিবে। তুমি যদি ঈর্ষা ও ঘৃণার ভাব পোষণ কর এবং ঐ ভাব চতুর্দিকে প্রেরণ কর, তবে বর্ধিতভাবে উহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। জগতের কোন শক্তিই উহা নিবারণ করিতে পারিবে না। তুমি যখন একবার ঐ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্য তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে। এইটি স্মরণ করিলে তুমি অসৎকার্য হইতে নিবৃত্ত হইবে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥৩৫॥

যাহার অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সমীপে অপরের স্বাভাবিক বৈরিতাও পরিত্যক্ত হয়।

যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার আদর্শ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন, তবে, তাঁহার সম্মুখে যে-সকল প্রাণী স্বভাবতই হিংস্র, তাহারাও শান্তভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাঘ্র ও মেঘ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থা লাভ হইলে তবে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি অহিংসভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥৩৬॥

হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন কর্ম না করিয়াই যোগী নিজের জন্য বা অপরের জন্য সেই কর্মের ফল লাভ করিবার শক্তি অর্জন করেন।

যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন স্বপ্নেও তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, যখন কায়মনোবাক্যে সত্য আচরণ করিবে, তখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই সত্য হইয়া যাইবে। তখন তুমি যদি কাহাকেও বল, 'তুমি কৃতার্থ হও', সে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বল, 'রোগমুক্ত হও', সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়া যাইবে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্ ॥৩৭॥

অচৌর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সমুদয় ধনরত্নাদি আসিয়া থাকে।

তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে, প্রকৃতি ততই তোমার অনুসরণ করিবে; আর তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥৩৮॥

ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য বা শক্তি লাভ হয়।

ব্রহ্মচর্যবান্ ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি—মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। পবিত্রতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্ভব নয়। ব্রহ্মচর্য দ্বারা মানুষের উপর আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করা যায়। মানবসমাজের ধর্ম-নেতাগণ সকলেই ব্রহ্মচর্যবান্ ছিলেন, এই ব্রহ্মচর্য হইতেই তাঁহারা শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; অতএব যোগী অবশ্যই ব্রহ্মচর্যবান্ হইবেন।

অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥৩৯॥

অপরিগ্রহ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বজন্ম স্মৃতিপথে উদিত হইবে।

যখন কেহ অপরের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করেন না, তখন তাঁহার অপরের সহিত বাধ্যবাধকতা হয় না, তিনি স্বাধীন ও মুক্তই থাকেন। তাঁহার মন শুদ্ধ হইয়া যায়। প্রতিটি দানের সহিত দাতার মন্দ ভাবগুলিও গ্রহণ করিতে হইতে পারে। এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হইয়া যায়, আর ইহা হইতে যে-সকল শক্তি লাভ হয়, তন্মধ্যে প্রথম—পূর্বজন্মকথা মনে করিতে পারা। তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজ আদর্শে দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারেন। কারণ তিনি দেখিতে পান, বহুবার তিনি কেবল যাওয়া-আসা করিতেছেন। সুতরাং তিনি তখন হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞারূঢ় হন যে,

এইবার আমি মুক্ত হইব, আর যাওয়া-আসা করিব না, আর প্রকৃতির দাস হইব না।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥৪০॥

শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়, অন্যের সঙ্গ করিতেও আর প্রবৃত্তি থাকে না।

যখন বাস্তবিক বাহ্য ও আন্তর—উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন শরীরের প্রতি অযত্ন আসে; কিসে উহা ভাল থাকিবে, কিসেই বা উহা সুন্দর দেখাইবে, এ-সকল ভাব একেবারে চলিয়া যায়। অপরে যে মুখ অতি সুন্দর অতি সুন্দর বলিবে, তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর নিকট তাহা পশুর মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জগতের লোক যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তাহার পশ্চাতে চৈতন্যের প্রকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বর্গীয় মনে করিবেন। এই দেহতৃষ্ণা মনুষ্যজীবনে সর্বনাশের কারণ। সুতরাং শৌচ-প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি নিজে একটি শরীর বলিয়া ভাবিতে চাহিবে না। আমাদের মধ্যে যখন এই শৌচ বা পবিত্রতা আসে, তখনই আমরা এই দেহভাব অতিক্রম করিতে পারি।

সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥৪১॥

এই শৌচ হইতে সত্ত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল ভাব, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

এই শৌচ-অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্বগুণ বর্ধিত হইবে, সুতরাং মনও একাগ্র ও প্রফুল্ল হইবে। তুমি যে ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছ, তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি বেশ প্রফুল্ল হইতেছ। বিষাদপূর্ণ ভাব অবশ্য অজীর্ণ রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম নয়। সুখই সত্ত্বের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম; সাত্ত্বিক ব্যক্তির পক্ষে সবই সুখময় বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং যখন তোমার এই আনন্দের ভাব আসিতে থাকিবে, তখন তুমি বুঝিবে, তুমি যোগসাধনায় উন্নতি করিতেছ। যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণা তমোগুণপ্রসূত, সুতরাং উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। বিষণ্ণতা তমোগুণের একটি লক্ষণ। সবল, দৃঢ়, সুস্থকায়, যুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই যোগী হইবার উপযুক্ত। যোগীর দৃষ্টিতে সবই সুখময়। যে-কোন মনুষ্যমুখ তিনি দেখেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ হয়। ইহাই ধার্মিক লোকের লক্ষণ। পাপই কষ্টের কারণ, আর অন্য কিছু নয়। বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহা ভয়ঙ্কর! এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না, কখন এইরূপ হইলে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সারাদিন ঘরে কাটাইয়া দাও। সমাজে, সংসারে এই ব্যাধি সংক্রামিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যখন তোমার মন সংযত হইবে, তখন তুমি সমুদয় শরীরও বশে রাখিতে পারিবে। তখন আর তুমি এই যন্ত্রের ক্রীতদাস থাকিবে না; এই দেহযন্ত্রই

তোমার ভৃত্য হইয়া থাকিবে। দেহযন্ত্র আত্মাকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে না, বরং উহাই মুক্তিপথে শ্রেষ্ঠ সহায় হইবে।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥৪২॥

সন্তোষ হইতে পরম সুখলাভ হয়।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥৪৩॥

অশুদ্ধি-ক্ষয়-নিবন্ধন তপস্যা হইতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার শক্তি আসে।

তপস্যার ফল কখনও কখনও সহসা দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥৪৪॥

মন্ত্রাদির পুনঃপুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হইয়া থাকে।

যে পরিমাণে উচ্চ প্রাণী (দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ) দেখিবার ইচ্ছা করিবে, সাধনাও সেই পরিমাণে কঠোর করিতে হইবে।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥৪৫॥

ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরে নির্ভরের দ্বারা সমাধি ঠিক পূর্ণা হয়।

স্থিরসুখামাসনম্ ॥৪৬॥

যেভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসিয়া থাকা যায়, তাহার নাম আসন।

এখন আসনের কথা বলা হইবে। যতক্ষণ তুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি প্রাণায়াম ও অন্যান্য সাধনে কিছুতেই কৃতকার্য হইবে না। আসন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই যে, তুমি শরীরের অস্তিত্ব মোটেই অনুভব করিবে না। এইরূপ হইলে বাস্তবিক আসন দৃঢ় হইয়াছে, বলা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে তুমি যদি কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিতে চেষ্টা কর, শরীরে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিতে থাকিবে, কিন্তু যখনই তুমি এই স্থূলদেহভাব অতিক্রম করিবে, তখন শরীরবোধ হারাইয়া ফেলিবে। তখন আর তুমি সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার যখন তোমার শরীরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, তখন অনুভব করিবে, যেন অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছ। যদি শরীরকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হয়, তবে উহা এইরূপেই হইতে পারে। যখন তুমি এইরূপে শরীরকে জয় করিয়া উহাকে দৃঢ় রাখিতে পারিবে, তখন তোমার সাধনাও দৃঢ় হইবে। কিন্তু যতক্ষণ তোমার শারীরিক

বিঘ্নবাধাগুলি আসিতে থাকিবে, ততক্ষণ তোমার স্নায়ুমণ্ডলী চঞ্চল থাকিবে এবং তুমি কোনরূপে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পারিবে না।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥৪৭॥

শরীরে যে এক প্রকার অভিমানাত্মক প্রযত্ন আছে, তাহা শিথিল করিয়া দিয়া ও অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন স্থির ও সুখকর হইতে পারে।

অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন অবিচলিত হইতে পারে। অবশ্য আমরা সেই নিরপেক্ষ অনন্ত (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে (সহজে) চিন্তা করিতে পারি না, কিন্তু আমরা অনন্ত আকাশের বিষয় চিন্তা করিতে পারি।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥৪৮॥

এইরূপে আসন-জয় হইলে দ্বন্দ্ব-পরম্পরা আর কিছু বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না।

দ্বন্দ্ব অর্থে শুভ-অশুভ, শীত-উষ্ণ, আলোক-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিপরীতধর্মী দুই দুই পদার্থ। এগুলি আর তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥৪৯॥

এই আসন-জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত করাকে ‘প্রাণায়াম’ বলে।

যখন এই আসন-জয় সমাপ্ত হইয়াছে, তখন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, এখান হইতে প্রাণায়ামের বিষয় আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম কি? শরীরস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে আনা। যদিও ‘প্রাণ’ শব্দ সচরাচর শ্বাসপ্রশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক উহা শ্বাসপ্রশ্বাস নয়। ‘প্রাণ’ অর্থে জাগতিক শক্তিসমষ্টি। উহা প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শক্তি, এবং উহার বাহ্যপ্রকাশ—এই ফুসফুসের গতি। প্রাণ যখন শ্বাসকে ভিতর দিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই গতি আরম্ভ হয়; ‘প্রাণায়াম’-এ আমরা উহাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে চাই। এই প্রাণের উপর শক্তিলাভ করিবার সহজতম উপায়রূপে আমরা প্রথমে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করি।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥৫০॥

বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ভেদে এই প্রাণায়াম ত্রিবিধ; দেশ, কাল, সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম হওয়াতে উহাদেরও আবার নানাপ্রকার ভেদ আছে।

এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত। প্রথম—যখন আমরা শ্বাসকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করি; দ্বিতীয়—যখন আমরা উহা বাহিরে

নিক্ষেপ করি; তৃতীয়—যখন শ্বাস ফুসফুসের মধ্যেই ধৃত হয় বা বাহির হইতে শ্বাসগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়। উহারা আবার দেশ, কাল ও সংখ্যা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। 'দেশ' অর্থে—প্রাণকে শরীরের কোন অংশবিশেষে আবদ্ধ রাখা। 'সময়' অর্থে—প্রাণ কোন্ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, এবং 'সংখ্যা' অর্থে—কতবার ঐরূপ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইবে। এইজন্য কোথায়, কতক্ষণ ও কতবার রেচকাদি করিতে হইবে, ইত্যাদি কথিত হইয়া থাকে। এই প্রাণায়ামের ফল 'উদ্ঘাত' অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥৫১॥

চতুর্থ প্রকার প্রাণায়ামে বাহ্য বা আন্তর বিষয় চিন্তা দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ করা হয়।

ইহা চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম। ইহাতে পূর্বোক্ত চিন্তাসহ দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা স্বাভাবিক কুম্ভক (স্তম্ভবৃত্তি) হইয়া থাকে। অন্য প্রাণায়ামগুলিতে চিন্তার সংস্রব নাই।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥৫২॥

তাহা হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়।

চিত্তে স্বভাবতই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহা সত্ত্বপদার্থ দ্বারা নির্মিত, কিন্তু উহা রজঃ ও তমোদ্বারা আবৃত্ত রহিয়াছে। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের এই আবরণ দূরীভূত হয়।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥৫৩॥

(তাহা হইতেই) 'ধারণা' বিষয়ে মনের যোগ্যতা হয়।

এই আবরণ চলিয়া গেলে আমরা মনকে একাগ্র করিতে সমর্থ হই।

স্বস্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্ত-স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪॥

যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে 'প্রত্যাহার' বলা যায়।

এই ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক ঐ পুস্তকাকৃতি বাহিরে নাই, উহা মনেই অবস্থিত বাহিরের কোন কিছু ঐ আকৃতি জাগাইয়া দেয় মাত্র; বাস্তবিক রূপ বা আকৃতি চিত্তেই আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলি, তাহাদের সম্মুখে যাহা আসিতেছে, তাহারই সহিত মিশিয়া গিয়া তাহারই আকার গ্রহণ করিতেছে। যদি তুমি মনের এই-সকল ভিন্ন

ভিন্ন আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পার, তবে তোমার মন শান্ত হইবে এবং ইন্দ্রিয়গুলিও শান্ত হইবে। ইহাকেই 'প্রত্যাহার' বলে।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥৫৫॥

তাহা (প্রত্যাহার) হইতেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া থাকে।

যখন যোগী ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বহির্বস্তুর আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পারেন ও মনের সহিত উহাদিগকে এক করিয়া ধারণ করিতে কৃতকার্য হন, তখনই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে। আর যখন ইন্দ্রিয়গণ সর্বতোভাবে বশীভূত হয়, তখনই প্রত্যেকটি স্নায়ু ও মাংসপেশী বশে আসিয়া থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়গণই সর্বপ্রকার অনুভূতি ও কার্যের কেন্দ্রস্বরূপ। এই ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং যখন ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইবে, তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কার্যকে জয় করিতে পারিবেন; সমগ্র শরীরটিই তাঁহার বশীভূত হইবে। এইরূপ অবস্থা লাভ হইলেই মানুষ দেহধারণের আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে ঠিক ঠিক বলিতে পারে, 'জন্মিয়াছিলাম বলিয়া আমি সুখী।' যখন ইন্দ্রিয়গণের উপর এইরূপ শক্তিলাভ হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, বাস্তবিক এই শরীর অতি আশ্চর্য পদার্থ।

বিভূতিপাদ

এই অধ্যায়ে যোগের বিভূতি (শক্তি বা ঐশ্বর্য) আলোচিত হইবে।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥১॥

চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে ধরিয়া রাখার নাম 'ধারণা'।

যখন মন শরীরের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন বস্তুতে সংলগ্ন হয় ও কিছুকাল ঐ ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণা (একাগ্রতা) বলে।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥২॥

সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাহাকে 'ধ্যান' বলে।

মনে কর, মন যেন কোন একটি বিষয়ে চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন একটি বিশেষ স্থানে যথা, মস্তকের উপরে অথবা হৃদয়ে নিজেকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি মন শরীরের কেবল ঐ অংশ দিয়াই সর্বপ্রকার অনুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের সকল অঙ্গকে যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে,

তবে তাহার নাম ‘ধারণা’; আর মন যখন কিছুক্ষণ নিজেকে ঐ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তখন তাহাকে বলা হয় ‘ধ্যান’।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩॥

তাহাই যখন সমুদয় বাহ্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থমাত্রকে প্রকাশ করে, তখন ‘সমাধি’ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

যখন ধ্যানে বস্তুর আকৃতি বা বাহ্যভাগ পরিত্যক্ত হয়, তখনই এই সমাধি-অবস্থা আসে। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছি, ধীরে ধীরে আমি উহার উপর মন একাগ্র করিতে কৃতকার্য হইলাম, তখন কেবল ভিতরের ভাবগুলি অনুভব করিব, অর্থটুকু বুঝিব, কোনরূপ আকারে উহা প্রকাশিত হইবে না। ধ্যানের ঐ অবস্থাকে ‘সমাধি’ বলে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥৪॥

এই তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ একই বস্তুর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়, তখন তাহাকে ‘সংযম’ বলে।

যখন কেহ তাঁহার নিজের মনকে কোন নির্দিষ্ট দিকে লইয়া গিয়া কোন বস্তুর উপর স্থির করিতে পারেন, পরে অন্তর্ভাগ হইতে বাহ্য বস্তু পৃথক্ করিয়া তাহার উপর মনকে অনেকক্ষণ রাখিতে পারেন, তখনই ‘সংযম’ হইল। অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এইগুলি

একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে এক বস্তুর উপরে অভ্যস্ত হইয়া একত্র হয়। তখন বস্তুর বাহ্য আকার অন্তর্হিত হয়, মনে তাহার অর্থমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥৫॥

এই সংযমের দ্বারা যোগীর মনে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয়।

যখন কেহ এই সংযমসাধনে কৃতকার্য হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার আয়ত্ত হয়। এই সংযমই যোগীর জ্ঞানলাভের প্রধান যন্ত্র। জ্ঞানের বিষয় অনন্ত। উহারা স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ইত্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত। এই সংযম প্রথমতঃ স্থূল বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হয়, আর যখন স্থূলের জ্ঞানলাভ হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়া স্তরে স্তরে উহা সূক্ষ্মতর বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥৬॥

এই সংযম সোপানক্রমে প্রয়োগ করা উচিত।

খুব দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই সূত্র এইরূপ সাবধান করিয়া দিতেছে।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ ॥৭॥

এই তিনটি পূর্বকথিত সাধনগুলি অপেক্ষা আরও অন্তরঙ্গ সাধন।

পূর্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের বিষয় কথিত হইয়াছে। উহারা ধারণা, ধ্যান ও সমাধির তুলনায় বহিরঙ্গ। এই 'ধারণা'দি অবস্থা লাভ করিলে মানুষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ হইতে পারে, কিন্তু সর্বজ্ঞতা বা সর্বশক্তিমত্তা তো মুক্তি নয়। ঐ ত্রিবিধ সাধন দ্বারা মন নির্বিকল্পক অর্থাৎ পরিণামশূন্য হইতে পারে না, ঐ ত্রিবিধ সাধন আয়ত্ত হইলেও দেহধারণের বীজ থাকিয়া যাইবে। যোগীদের ভাষায় সেই বীজগুলি 'ভর্জিত' হইয়া গেলেই তাহাদের নূতন অঙ্কুর উৎপন্ন করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিভূতিসমূহ বীজগুলি ভর্জিত করিতে পারে না।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥৮॥

কিন্তু এই 'সংযম'ও (ধারণা ধ্যান সমাধি একত্র) নির্বীজ সমাধির পক্ষে বহিরঙ্গস্বরূপ।

এই কারণে নির্বীজ সমাধির সহিত তুলনা করিলে এইগুলিকেও বহিরঙ্গ বলিতে হইবে। আমরা এখনও প্রকৃত সর্বোচ্চ সমাধি-অবস্থা লাভ না করিয়া একটি নিম্নতরভূমিতেই আছি; সেই অবস্থায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এখনও আছে, বিভূতি বা সিদ্ধিসকল এই জগতেরই অন্তর্গত।

ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ

নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥৯॥

যখন ব্যুত্থান অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্যের অভিভব (নাশ) ও নিরোধসংস্কারের আবির্ভাব হয়, তখন চিত্ত নিরোধনামক অবসরের অনুগত হয়, উহাকে নিরোধ-পরিণাম বলে।

ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়; কারণ তাহা হইলে কোন প্রকার বৃত্তিই থাকিত না। মনে কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদিত হইয়াছে, যাহা মনকে ইন্দ্রিয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, আর যোগী ঐ বৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এ অবস্থায় ঐ সংযমচেষ্টাটিকেও একটি বৃত্তি বলিতে হইবে। একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গ দ্বারা নিবারিত হইল, সুতরাং উহা সর্ব তরঙ্গের নিবৃত্তিরূপ সমাধি নয়, কারণ ঐ সংযমটিও একটি তরঙ্গ। তবে যে অবস্থায় মনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তদপেক্ষা এই নিম্নতর সমাধি সেই উচ্চতর সমাধির খুবই নিকটবর্তী।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥১০॥

অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরতা হয়।

দিনের পর দিন অভ্যাস করিলে মনঃসংযমের এই নিরন্তরচেষ্টাপ্রবাহ স্থির হইয়া যায় এবং মন সর্বদা একাগ্র হইবার শক্তি লাভ করে।

সর্বার্থ তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥১১॥

মনে সর্বপ্রকার বস্তু গ্রহণ করা ও এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা, এই দুইটির যখন যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় হয়, তাহাকে চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলে।

মন সর্বদাই নানাপ্রকার বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সর্বপ্রকার বস্তুতেই যাইতেছে—ইহা নিম্ন অবস্থা। ইহা অপেক্ষা মনের একটি উচ্চতর অবস্থা আছে, সেখানে মন একটিমাত্র বস্তু গ্রহণ করে এবং আর সকল বস্তু ত্যাগ করে। এই এক বস্তু গ্রহণ করার ফল সমাধি।

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥১২॥

যখন মন শান্ত ও উদিত অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই তুল্যপ্রত্যয় হয়, অর্থাৎ উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে।

কি করিয়া জানা যাইবে—মন একাগ্র হইয়াছে? মন একাগ্র হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না। অজ্ঞাতসারে যতই সময় অতিবাহিত হয়, বুঝিতে হইবে, আমরা ততই একাগ্র হইতেছি।

সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যখন আমরা খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে মগ্ন হই, তখন সময়ের দিকে আমাদের কোন লক্ষ্যই থাকে না; আবার যখন পুস্তকপাঠে বিরত হই তখন ভাবিয়া আশ্চর্য হই, কতখানি সময় চলিয়া গিয়াছে। সমুদয় সময়টি যেন একত্র হইয়া বর্তমানে একীভূত হইবে। এইজন্যই বলা হইয়াছে, যখন অতীত ও বর্তমান আসিয়া একত্র মিলিত হয়, তখনই মন একাগ্র হইয়া থাকে।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৩॥

ইহা দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইল।

পূর্ব তিনটি সূত্রে যে চিত্তের নিরোধাদি পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-রূপ তিন প্রকার পরিণামের ব্যাখ্যা করা হইল। মন ক্রমাগ্রত বৃত্তিরূপে পরিণত হইতেছে, ইহা মনের 'ধর্মরূপ' পরিণাম। উহা যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের মধ্য দিয়া চলিতেছে, ইহাই মনের 'লক্ষণরূপ' পরিণাম; আর কখনও যে নিরোধ-সংস্কার প্রবল ও ব্যুত্থান-সংস্কার দুর্বল অথবা তাহার বিপরীত হয়, ইহা মনের 'অবস্থারূপ' পরিণাম। মনের এই পরিণামত্রয়ের ন্যায় ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ত্রিবিধ পরিণামও বুঝিতে হইবে। যথা, মৃত্তিকারূপ ধর্মীর

পিণ্ডরূপ ধর্ম গিয়া উহাতে যে ঘটাকার ধর্ম আবির্ভূত হয়, তাহা ধর্ম-পরিণাম। ঐ ঘটের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থারূপ পরিণামকে লক্ষণ-পরিণাম এবং উহার নূতনত্ব ও পুরাতনত্বাদি অবস্থারূপ পরিণামকে অবস্থা-পরিণাম বলে।

পূর্ব পূর্ব সূত্রে যে-সকল সমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য যোগী যাহাতে মনের বৃত্তি বা পরিণামগুলির উপর ইচ্ছাপূর্বক ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে পারেন। তাহা হইতে পূর্বোক্ত সংযমশক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী ॥১৪॥

শান্ত (অর্থাৎ অতীত), উদিত (বর্তমান) ও অব্যপদেশ্য (ভবিষ্যৎ) ধর্ম যাহাতে অবস্থিত, তাহার নাম ধর্মী।

ধর্মী তাহাকেই বলে যাহার উপর কাল ও সংস্কার কার্য করিতেছে, যাহা সর্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত ও ব্যক্তভাব ধারণ করিতেছে।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥১৫॥

ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমের বিভিন্নতা (পূর্বাপর পার্থক্য)।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥১৬॥

পূর্বোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম করিলে অতীত ও অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

পূর্বে সংযমের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহা যেন বিস্মৃত না হই। যখন মন-বস্তুর বাহ্যভাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার অভ্যন্তরীণ ভাবগুলির সহিত নিজেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন একমাত্র সেইটিই ধারণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকে 'সংযম' বলে। এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে কেবল সংস্কারের পরিণামগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। কতকগুলি সংস্কার বর্তমান অবস্থায় কার্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে আর কতকগুলি এখনও ফল প্রদান করিবে বলিয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। এইগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিয়া তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় জানিতে পারেন।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ

সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥১৭॥

শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের আরোপ জন্য এইরূপ সঙ্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে সমুদয় ভূতের রুত (শব্দ) জ্ঞান হইয়া থাকে।

‘শব্দ’ বলিলে বুঝিতে হইবে বাহ্যবিষয়, যাহাতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত করিয়া দেয়; ‘অর্থ’ বলিলে বুঝিতে হইবে, যে শরীরাভ্যন্তরীণ প্রবাহ ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা লব্ধ বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাকে লইয়া গিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয় তাহাকে; আর ‘জ্ঞান’ বলিলে বুঝিতে হইবে মনের সেই প্রতিক্রিয়া, যাহা হইতে বিষয়ানুভূতি হয়। এই তিনটি মিশ্রিত হইয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে একটি স্পন্দন হইল, তারপর একটি আন্তরবেদনাপ্রবাহ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা মনে নীত হইলে, তখন মন প্রতিঘাত করিল, এবং আমি (অর্থ সহ) শব্দটি জানিতে পারিলাম। আমি ঐ যে শব্দটি জানিলাম, উহা তিনটি পদার্থের মিশ্রণ—প্রথম কম্পন, দ্বিতীয় বেদনাপ্রবাহ ও তৃতীয় প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ এই তিনটি পৃথক্ করা যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা যোগী উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারেন। সাধক যখন এগুলিকে পৃথক্ করিবার শক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যে-কোন শব্দের উপর ‘সংযম’ প্রয়োগ করেন তাহার উদ্দিষ্ট অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন—তা ঐ শব্দ মনুষ্যকৃতই হউক বা অন্য কোন প্রাণিকৃতই হউক।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥১৮॥

সংস্কারগুলি ধরিতে পারিলে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, সবই আমাদের চিত্তে তরঙ্গাকারে আসিয়া থাকে, উহা আবার চিত্তেই মিলাইয়া যায়, ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। উহা সেখানে অতি সূক্ষ্ম আকারে থাকে, যদি আমরা ঐ তরঙ্গটি পুনরায় উত্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাই 'স্মৃতি' হইল। সুতরাং যোগী যদি মনের এই-সকল পূর্বসংস্কারের উপর 'সংযম' করিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহার পূর্ব পূর্ব সকল জন্মের কথা স্মরণ করিতে থাকিবেন।

প্রত্যয়স্য পরচিত্ত-জ্ঞানম্ ॥১৯॥

অপরের শরীরে যে-সকল চিহ্ন আছে, সেগুলিতে সংযম করিলে ঐ ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই কতকগুলি বিশেষ প্রকার চিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করা যায়। যখন যোগী কোন ব্যক্তির এই বিশেষ চিহ্নগুলির উপর 'সংযম' করেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির মনের গঠন বা অবস্থা জানিতে পারেন।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥২০॥

কিন্তু ঐ চিত্তের অবলম্বন কি, তাহা জানিতে পারেন না, কারণ উহা তাঁহার সংযমের বিষয় নয়।

শরীরের উপর ‘সংযম’ করিয়া মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা তিনি জানিতে পারিবেন না। সেজন্য দুইবার ‘সংযম’ করিবার আবশ্যক হইবে, প্রথম শরীরের লক্ষণসমূহের উপর ও তারপর মনেরই উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে যোগী সেই ব্যক্তির মনে কি আছে, সবই জানিতে পারিবেন।

কায়রূপসংযমাত্তদ্ গ্রাহ্যশক্তি-স্তম্ভে

চক্ষুঃপ্রকাশাহসম্প্রয়োগে হন্তর্ধানম্ ॥২১॥

দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া ঐ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তি স্তম্ভিত (বাধাপ্রাপ্ত) ও চক্ষুর প্রকাশ-শক্তির সহিত উহার অসংযোগ হইলে যোগী লোকসমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন।

মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; তিনি আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন। তিনি যে বাস্তবিক অন্তর্হিত হন তাহা নয়, তবে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না এইমাত্র। শরীরের আকৃতি ও শরীর এই দুইটিকে তিনি যেন পৃথক্ করিয়া ফেলেন। এটি যেন স্মরণ থাকে, যোগী যখন এরূপ একাগ্রতা-শক্তি লাভ করেন যে, বস্তুর আকার ও বস্তুকে পরস্পর পৃথক্ করিতে পারেন, তখনই তিনি ঐভাবে অদৃশ্য হইতে পারেন। যোগী আকার ও ঐ আকারবান্ বস্তুর পার্থক্যের উপর সংযম প্রয়োগ করেন এবং ঐ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তিকে

বাধা দেন। আকৃতি ও আকারবান্ বস্তুর সংযোগ হইতেই আমরা আকৃতি উপলব্ধি করি।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্ ॥২২॥

ইহার দ্বারাই শব্দাদির অন্তর্ধান অর্থাৎ শব্দাদিকে অপরের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে না দেওয়াও ব্যাখ্যা করা হইল।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদ -

পরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥২৩॥

কর্ম দুই প্রকার, এক প্রকারের ফল শীঘ্র লাভ হইবে, অন্য প্রকার বিলম্বে ফল প্রসব করিবে। ইহাদের উপর ‘সংযম’ করিলে অথবা অরিষ্ট-নামক মৃত্যুলক্ষণসমূহের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীরা দেহত্যাগের সঠিক সময় অবগত হইতে পারেন।

যখন যোগী তাঁহার নিজ কর্মের উপর অর্থাৎ তাঁহার মনের ভিতর যে সংস্কারগুলির কার্য আরম্ভ হইয়াছে ও যেগুলি ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তখন তিনি যেগুলি ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলি দ্বারা জানিতে পারেন—কবে তাঁহার শরীরপাত হইবে। কোন্ দিন, কটার সময়ে, এমন কি কত মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহাও তিনি জানিতে পারেন। মৃত্যু যে সর্বদা আসন্ন—এইটি জানা হিন্দুরা

বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন, কারণ গীতায় এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, মৃত্যুকালীন চিন্তা পরজীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে বিশেষ শক্তিশালী।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥২৪॥

মৈত্রী করুণা ইত্যাদি (১।৩৩) গুণগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগী ঐ গুণগুলির প্রকর্ষতা লাভ করেন।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥২৫॥

হস্তী প্রভৃতির বলের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীর শরীরে সেই সেই প্রাণীর তুল্য বল আসে।

যখন যোগী এই সংযমশক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যদি বল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন এবং হস্তীর বলের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপায় জানে, তবে ঐ শক্তি লইয়া ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। যোগী উহা লাভ করিবার বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥২৬॥

(পূর্বকথিত) মহা-জ্যোতির (১।৩৬) উপর সংযম করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে।

হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতিঃ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে অতি দূরবর্তী বস্তুও তিনি দেখিতে পান। যদি কোন বস্তু পাহাড়ের আড়ালে থাকে, তাহা এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুও তিনি দেখিতে পারেন।

ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ ॥২৭॥

সূর্যে সংযমের দ্বারা সমগ্র জগতের জ্ঞানলাভ হয়।

চন্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম্ ॥২৮॥

চন্দ্রে সংযম করিলে তারকাসমূহের জ্ঞানলাভ হয়।

ধ্রবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥২৯॥

ধ্রুবতারায় চিত্তসংযম করিলে তারাসমূহের গতিজ্ঞান হয়।

নাভিচক্রে কায়ব্যুহ-জ্ঞানম্ ॥৩০॥

নাভিচক্রে চিত্তসংযম করিলে শরীরের গঠন জানা যায়।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥৩১॥

কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয়।

অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কণ্ঠকূপে চিত্তসংযম করিতে পারেন, তবে তাঁহার ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয়।

কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্ ॥৩২॥

কূর্মনাড়ীতে চিত্তসংযম করিলে শরীরের স্থিরতা আসে।

যখন তিনি সাধনা করেন, তখন তাঁহার শরীর চঞ্চল হয় না।

মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥৩৩॥

মস্তিষ্কের জ্যোতির উপর সংযম করিলে সিদ্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ হয়।

সিদ্ধগণ ভূতযোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরের। যোগী যখন তাঁহার মস্তকের উপরিভাগে মনঃসংযম করেন, তখন তিনি এই সিদ্ধগণের দর্শন পান। এখানে 'সিদ্ধ' শব্দে মুক্তপুরুষ বুঝাইতেছে না, যদিও সচরাচর উহা ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রাতিভাদ্বা সর্বম্ ॥৩৪॥

অথবা প্রতিভা-শক্তিদ্বারা সমুদয় জ্ঞান লাভ হয়।

যাঁহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ পবিত্রতার দ্বারা লব্ধ-জ্ঞান-বিশেষ আছে, (পূর্বোক্ত) কোন প্রকার সংযম ব্যতীতই তাঁহারা এই সমুদয় জ্ঞানের অধিকারী হন। যখন মানুষ উচ্চ প্রতিভা-শক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি এই মহা আলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট সবই স্পষ্ট হইয়া যায়। কোন প্রকার 'সংযম' ব্যতীতই, সমুদয় জ্ঞান স্বতই তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ ॥৩৫॥

হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্

ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥৩৬॥

পুরুষ ও বুদ্ধির বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপরের বা পুরুষের জন্য। বুদ্ধির অন্য এক অবস্থার নাম 'স্বার্থ'; উহার উপর সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়।

পুরুষ ও বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা হইলেও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহার সহিত আপনাকে অভেদভাবাপন্ন মনে করে এবং তাহাতেই নিজেকে সুখী বা দুঃখী বোধ করিয়া থাকে। বুদ্ধির এই অবস্থাকে 'পরার্থ' বলে, কারণ উহার সমুদয় ভোগ নিজের জন্য নয়—পুরুষের জন্য। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধির আর

এক অবস্থা আছে—উহার নাম ‘স্বার্থ’। যখন বুদ্ধি সত্ত্বপ্রধান হইয়া অতিশয় নির্মল হয়, তখন তাহাতে পুরুষ বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হন, এবং সেই বুদ্ধি অন্তর্মুখী হইয়া পুরুষমাত্রাবলম্বন হয়। সেই স্বার্থ-নামক বুদ্ধিতে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। পুরুষমাত্রাবলম্বনবুদ্ধিতে সংযম করিতে বলার উদ্দেশ্য এই—শুদ্ধ পুরুষ জ্ঞাত বলিয়া কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে ॥৩৭॥

তাহা হইতে প্রাতিভ(অলৌকিক) শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ও ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥৩৮॥

ইহারা সমাধির পথে বাধা, কিন্তু সংসার-অবস্থায় উহারা সিদ্ধির স্বরূপ।

যোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোগ পুরুষ ও মনের যোগ হইতে হইয়া থাকে, যদি তিনি ‘আত্মা ও প্রকৃতি পরস্পর পৃথক্ বস্তু’ এই সত্যের উপর চিত্তসংযম করিতে পারেন, তবে তিনি ‘পুরুষ’-এর জ্ঞান লাভ করেন। তাহা হইতে বিবেকজ্ঞান উদিত হয়। যখন তিনি এই ‘বিবেক’ লাভে কৃতকার্য হন, তখন তাঁহার প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই শক্তিসমুদয় সেই

উচ্চতম লক্ষ্যের পথে বাধা অর্থাৎ সেই পবিত্র আত্মার জ্ঞানের ও মুক্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। পথিমধ্যে যেন এগুলির সহিত সাক্ষাৎ হয়। যোগী যদি এগুলি পরিত্যাগ করেন, তবেই তিনি সেই উচ্চতম জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। যদি তিনি এই শক্তিগুলি লাভ করিতে প্রলুব্ধ হন, তবে তাঁহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য

পরশরীরাবেশঃ ॥৩৯॥

যখন চিত্তের বন্ধনের কারণ শিথিল হইয়া যায় ও চিত্তের প্রচারস্থানগুলিকে (অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীসমূহকে) অবগত হন, তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন।

যোগী অন্য এক দেহে অবস্থান করিয়া সেই দেহে ক্রিয়াশীল থাকিলেও কোন মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে উঠাইয়া গতিশীল করিতে পারেন। অথবা তিনি কোন জীবিত শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে রুদ্ধ করিয়া সাময়িকভাবে সেই শরীরের মধ্য দিয়া কার্য করিতে পারেন। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান লাভ করিলেই তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে সেই শরীরে 'সংযম' প্রয়োগ করিলেই ইহা সিদ্ধ হইবে, কারণ তাঁহার আত্মাই যে সর্বব্যাপী তাহা নয়, তাঁহার মনও সর্বব্যাপী—অবশ্য যোগীদিগের

মতে। উহা সেই সর্বব্যাপী মনের এক অংশমাত্র। এখন কিন্তু উহা কেবল এই শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই কার্য করিতে পারে, কিন্তু যোগী যখন স্নায়বীয় প্রবাহগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন, তখন তিনি অন্যান্য বস্তু বা শরীরের দ্বারাও কার্য করিতে পারেন।

উদানজয়াজ্জল -পঙ্ক-কণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥৪০॥

উদান-নামক স্নায়ুপ্রবাহ জয় করিতে পারিলে যোগী জলে বা পঙ্কে মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু হন।

'উদান'-নামক যে স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ফুসফুস ও শরীরের উপরিস্থ সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী যখন তাহা জয় করিতে পারেন, তখন তিনি অতিশয় লঘু হইয়া যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কণ্টকের উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে চলিতে পারেন, অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন, এবং ইচ্ছামাত্র এই শরীর ত্যাগ করিতে পারেন।

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্ ॥৪১॥

সমান-প্রবাহকে জয় করিলে তিনি জ্যোতিঃ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকেন।

এ-অবস্থায় তিনি যখনই ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হয়।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমান্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥৪২॥

কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়।

এই আকাশ (ইথার) ও তাহাকে অনুভব করিবার যন্ত্রস্বরূপ কর্ণ রহিয়াছে। ইহাদের উপর সংযম করিলে যোগী দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। তখন তিনি সমুদয় শব্দ শুনিতে পান। বহুদূরে কোন কথাবার্তা বা শব্দ হইলে তাহাও তিনি শুনিতে পান।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥৪৩॥

শরীরের ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিত্তসংযম করিয়া এবং তুলা প্রভৃতির ন্যায় আপনাকে লঘু ভাবনা করিয়া যোগী আকাশের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারেন।

আকাশই এই শরীরের উপাদান; আকাশই এক বিশেষরূপে এই শরীর হইয়াছে। যদি যোগী শরীরের উপাদান ঐ আকাশ-ধাতুর উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হন ও বায়ুর মধ্য দিয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন।

বহিরকল্পিতা বৃত্তিমহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥৪৪॥

দেহের বাহিরে মনের যে 'যথার্থ বৃত্তি' অর্থাৎ মনের ধারণা, তাহার নাম 'মহাবিদেহ'; তাহার উপর সংযম প্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে আবরণ, তাহা ক্ষয় হইয়া যায়।

মন অজ্ঞতাবশতঃ বিবেচনা করে, সে এই দেহের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। যদি মন সর্বব্যাপী হয়, তবে আমি কেবল এক প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে কেন, অথবা এই অহংকে একটি শরীরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিব কেন? ইহার তো কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগী চান, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি এই 'আমিত্ব' অনুভব করিবেন। অহংভাব চলিয়া গিয়া যে মানসিক বৃত্তিপ্রবাহ এই দেহে জাগরিত হয়, তাহাকে 'অকল্পিতা বৃত্তি' বা 'মহাবিদেহ' বলে। যখন তিনি উহার উপর 'সংযম' করিতে পারেন, তখন প্রকাশের সকল আবরণ চলিয়া যায় এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সমস্তই তাঁহার নিকট জ্ঞানময়-চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়।

স্থূলস্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্ব--সংযমাম্ভূতজয়ঃ ॥৪৫॥

ভূতগণের স্থূল স্বরূপ, সূক্ষ্ম অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ভূতজয় হয়।

যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংযম করেন; প্রথম স্থূলভূতের উপর, তারপর উহার সূক্ষ্ম অবস্থার উপর 'সংযম' করেন। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এই সংযমটি বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। খানিকটা কাদার তাল লইয়া তাঁহারা উহার উপর 'সংযম' প্রয়োগ করেন, ক্রমশঃ উহা যে-সকল সূক্ষ্মভূতে নির্মিত, তাহা দেখিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহারা ঐ সূক্ষ্মভূতের বিষয় জানিতে পারেন, তখনই তাঁহারা ঐ ভূতের উপর শক্তিলাভ করেন। সমুদয় ভূতের পক্ষেই এইরূপ বুঝিতে হইবে—যোগী এগুলি সবই জয় করিতে পারেন।

ততোহণিমাদি -প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎতদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ ॥৪৬॥

তাহা হইতেই অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়সম্পৎ লাভ হয় ও সমুদয় শারীরিক ধর্মের অনভিঘাত হয় (অর্থাৎ ধ্বংস হয় না)।

ইহার অর্থ এই যে, যোগী অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিজেকে ইচ্ছামত 'অণু' করিতে পারেন, খুব বৃহৎ করিতে পারেন, পৃথিবীর ন্যায় গুরু ও বায়ুর ন্যায় লঘু করিতে পারেন, যাহার উপর ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই জয় করিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছায় সিংহ তাঁহার পদতলে মেষের ন্যায় শান্তভাবে বসিয়া থাকিবে ও তাঁহার সমুদয় বাসনাই তাঁহার ইচ্ছামত পরিপূর্ণ হইবে।

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥৪৭॥

কায়সম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য, সুন্দর অঙ্গকান্তি, বল ও বজ্রবৎ দৃঢ়তা বুঝায়।

তখন শরীর অবিনাশী হইয়া যায়, কিছুই উহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। যোগী যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কিছুই তাঁহার শরীর বিনাশ করিতে পারে না, কালদণ্ড ভঙ্গ করিয়া তিনি এই জগতে সশরীরে বাস করেন। বেদে লিখিত আছে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথবা কোন ক্লেশ হয় না।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥৪৮॥

ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যপদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগদাতৃত্ব—এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ইন্দ্রিয়-জয় হয়।

বাহ্য বস্তুর অনুভূতির সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মন হইতে বাহিরে যাইয়া বিষয়ের দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই উপলব্ধি ও অস্মিতার উৎপত্তি হয়। যখন যোগী উহাদের উপর এবং অপর দুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে 'সংযম' প্রয়োগ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন। যে-কোন বস্তু তুমি দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ—যথা একখানি পুস্তক—তাহা লইয়া তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর।

তারপর পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দ্বারা সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥৪৯॥

তাহা হইতে দেহে মনের ন্যায় বেগ, ইন্দ্রিয়গণের দেহনিরপেক্ষ শক্তিলাভ ও প্রকৃতিজয় হইয়া থাকে।

যেমন ভূতজয় দ্বারা কায়সম্পৎ লাভ হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা পূর্বোক্ত শক্তিসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং

সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥৫০॥

পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের উপর চিত্তসংযম করিলে সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ হয়।

যখন প্রকৃতি জয় করা হইয়া গিয়াছে ও পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ জানা গিয়াছে যে,

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥৫১॥

এগুলিকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, তখনই কৈবল্য লাভ হয়।

এই অবস্থায় সাধক কৈবল্য লাভ করেন, স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যান। যখন তিনি সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা—শক্তি-দুইটিও ত্যাগ করেন, তখন সমুদয় ভোগ, এমন কি দেবগণকৃত প্রলোভনও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন। যখন যোগী এই-সকল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হন। বাস্তবিক এই শক্তিগুলি কি? শুধু বিকার মাত্র। স্বপ্ন অপেক্ষা এগুলি কোন অংশে বড় নয়। সর্বশক্তিমত্তাও স্বপ্নতুল্য। উহা কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ মনের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই সর্বশক্তিমত্তা বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মনেরও পারে।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥৫২॥

দেবগণ প্রলোভিত করিলেও তাহাতে আসক্ত হওয়া বা আনন্দ বোধ (স্ময়) করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

আরও অনেক বিঘ্ন আছে। দেবতা ও অন্যেরা যোগীকে প্রলুব্ধ করিতে আসেন; তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, কেহ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যায়। আমরা যেমন ঈর্ষাপরায়ণ, দেবতারাও সেইরূপ, বরং কখনও কখনও আমাদের অপেক্ষা অধিক। পাছে পদভ্রষ্ট হন, সেই ভয়ে তাঁহারা অতিশয় ভীত। যে-সকল যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে

পারেন না, মৃত্যুর পর তাঁহারাই দেবতা হন। তাঁহারা সোজা পথ ছাড়িয়া পাশের এক গলিপথে চলিয়া যান এবং এই ক্ষমতাগুলি লাভ করেন। তাঁহাদের আবার জন্মাইতে হইবে, কিন্তু যিনি এতদূর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলোভনগুলিও প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনি একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥৫৩॥

ক্ষণ ও তাহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তিগুলি এড়াইবার উপায় কি? বিবেকবলে যখন সদসৎবিচার শক্তি হয়, তখনই এই-সকল বিঘ্ন চলিয়া যাইবে। যাহাতে বিবেকজ্ঞান দৃঢ় হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই সংযমের উপদেশ প্রদত্ত হইল। ক্ষণ অর্থাৎ কালের সূক্ষ্মতর অংশের এবং উহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযমের দ্বারা ইহা হইয়া থাকে।

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥৫৪॥

জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না, এবং সেজন্য তুল্য বোধ হয়, তাহাদিগকেও ঐ পূর্বোক্ত সংযমের দ্বারা পৃথক্ করিয়া জানা যাইতে পারে।

আমরা যে দুঃখ ভোগ করি, তাহা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যদৃষ্টির অভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা সকলেই মন্দকে ভাল বলিয়া ও স্বপ্নকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। আত্মাই একমাত্র সত্য, ইহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। শরীর মিথ্যা স্বপ্নমাত্র; আমরা ভাবি, আমরা শরীর। সুতরাং দেখা গেল, এই অবিবেকই দুঃখের কারণ। এই অবিবেক আবার অবিদ্যা হইতে প্রসূত। বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে বলও আসে, তখনই আমরা এই শরীর, স্বর্গ ও দেবাদির কল্পনা পরিহার করিতে সমর্থ হই। জাতি, চিহ্ন ও স্থান দ্বারা আমরা বস্তুগুলিকে পৃথক্ করিয়া থাকি। উদাহরণস্বরূপ একটি গাভীর কথা ধরা যাক। কুকুর হইতে গাভীর ভেদ জাতিগত। দুইটি গাভীর মধ্যে আমরা কিরূপে পরস্পর প্রভেদ করিয়া থাকি? চিহ্নের দ্বারা। আবার দুইটি বস্তু সর্বাংশে সমান হইলে আমরা স্থানগত ভেদের দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি। কিন্তু যখন বস্তুসকল এমন মিশাইয়া থাকে যে, ভেদ করিবার এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি কোন কাজে আসে না, তখন পূর্বোক্ত সাধনপ্রণালী-অভ্যাসের দ্বারা লব্ধ বিবেক-বলে আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি। যোগীদিগের উচ্চতম দর্শন এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্ধস্বভাব ও সদা পূর্ণস্বরূপ এবং বিশ্বজগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র 'অমিশ্র' বস্তু। শরীর ও মন মিশ্র পদার্থ, তথাপি আমরা সর্বদাই আমাদিগকে উহাদের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের মহাভ্রম এই যে, ঐ পার্থক্যটুকু নষ্ট

হইয়া গিয়াছে। যখন এই বিবেকশক্তি লাভ হয়, তখন মানুষ দেখিতে পায় যে, জগতের বাহ্য ও আন্তর—সকল বস্তুই মিশ্র পদার্থ, সুতরাং ঐগুলি ‘পুরুষ’ হইতে পারে না।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা-বিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫॥

যে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও বস্তুর সর্ববিধ অবস্থাকে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে ‘তারকজ্ঞান’ বলে।

‘তারক’ অর্থে যাহা যোগীকে সংসার (জন্ম-মৃত্যুর সাগর) হইতে তারণ করে। সমগ্র প্রকৃতির সূক্ষ্ম স্থূল সর্ববিধ অবস্থা এই জ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে। এই জ্ঞানে কোনরূপ ক্রম নাই। ইহা সমুদয় বস্তুকে যুগপৎ—-একদৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারে।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥৫৬॥

যখন সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হয়, তখনই কৈবল্যলাভ হয়।

কৈবল্যই আমাদের লক্ষ্য; যখন এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারা যায়, তখন আত্মা বুঝিতে পারেন যে, তিনি চিরকাল একাকী, ‘কেবল’ (শুদ্ধ); তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য আর কাহারও প্রয়োজন নাই। যতদিন আমরা আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও চাই, ততদিন আমরা দাসমাত্র। যখন পুরুষ জানিতে পারেন—তিনি

মুক্তস্বভাব ও তাঁহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় না —আর এই প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, তখনই তিনি মুক্তিলাভ করেন, তখনই তাঁহার এই কৈবল্যলাভ হয়। যখন আত্মা জানিতে পারেন যে, জগতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে দেবতা পর্যন্ত কোন কিছুরই উপর তিনি নির্ভর করেন না, তখন তাঁহার সেই অবস্থাকে কৈবল্য (পৃথকত্ব) ও পূর্ণতা বলে। যখন শুদ্ধি ও অশুদ্ধি উভয় মিশ্রিত 'সত্ত্ব' অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষেরই মত শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই এই কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে, তখন সেই শুদ্ধবুদ্ধি কেবল নির্গুণ পবিত্রস্বরূপ পুরুষকেই প্রতিফলিত করে।

—

কৈবল্যপাদ

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধায়ঃ ॥১॥

সিদ্ধি (শক্তি)-সমূহ জন্ম, ঔষধ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন হয়।

কখনও কখনও মানুষ পূর্বজন্মলব্ধ সিদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে সে যেন তাহাদের ফলভোগ করিতেই আসে। সাংখ্যদর্শনের পিতাস্বরূপ কপিল সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। 'সিদ্ধ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—যিনি সফল বা কৃতকার্য হইয়াছেন।

যোগীরা বলেন, রাসায়নিক উপায়ে অর্থাৎ ঔষধাদি দ্বারা এই-সকল শক্তি লাভ করা যাইতে পারে। তোমরা সকলেই জানো যে, রসায়নবিদ্যার প্রারম্ভ আলকেমি (alchemy) হইতে। মানুষ পরশ-পাথর (philosopher's stone), সঞ্জীবনী অমৃত (elixir of life) ইত্যাদির অন্বেষণ করিত। ভারতবর্ষে 'রসায়ন' নামে এক সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের মত ছিলঃ সূক্ষ্মতত্ত্বপ্রিয়তা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম—এ সব খুবই ভাল, কিন্তু এ-গুলি লাভ করিবার

একমাত্র উপায় এই শরীর। যদি মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্ন অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে সেই চরমলক্ষ্যে পৌঁছিতে অনেক সময় লাগিবে। মনে কর, কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে ইচ্ছুক। কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি করিতে না করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন সে আর এক দেহ লইয়া পুনরায় সাধন করিতে আরম্ভ করিল, আবার তাহার মৃত্যু হইল; এইরূপে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ সময় নষ্ট হইয়া গেল। যদি শরীরকে এরূপ সবল ও নিখুঁত করিতে পারা যায় যে, উহার জন্মমৃত্যু একেবারে বন্ধ হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে। এই কারণে এই রাসায়নেরা বলিয়া থাকেন, ‘প্রথমে শরীরকে খুব সবল কর।’ তাঁহারা বলেন, শরীরকে অমর করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মনের ভাব এই যে, শরীর গঠন করিবার কর্তা যদি মন হয়, আর ইহা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেই অনন্ত শক্তিপ্রকাশের এই একটি বিশেষ প্রণালীমাত্র, তবে এইরূপ প্রত্যেক প্রণালীর বাহির হইতে যথেচ্ছ শক্তি সংগ্রহ করিবার কোন সীমা নির্দিষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা চিরকাল এই শরীরকে রাখিতে পারিব না কেন? যত শরীর আমরা ধারণ করি, সব আমাদিগকেই গঠন করিতে হয়। যখনই এই শরীরের পতন হইবে, তখন আবার আমাদিগকেই আর একটি শরীর গঠন করিতে হইবে। যদি আমাদের এই ক্ষমতা থাকে, তবে এই শরীর

হইতে বাহিরে না গিয়া আমরা এখানেই এবং এখনই সেই গঠনকার্য করিতে পারিব না কেন? তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ সত্য। ইহা যদি সম্ভব হয় যে, আমরা মৃত্যুর পরও (কোন একভাবে) জীবিত থাকি এবং নিজ নিজ শরীর গঠন করি, তবে শরীরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করিয়া কেবল উহাকে ক্রমশঃ পরিবর্তিত করিয়া এই পৃথিবীতে (নূতনতর) শরীর গঠন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন? তাঁহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, পারদে ও গন্ধকে অত্যদ্ভুত শক্তি লুক্কায়িত আছে। এই দ্রব্যগুলি হইতে প্রস্তুত কোন বিশেষ ‘রসায়ন’ দ্বারা মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীরকে অবিকৃত রাখিতে পারে। অপর কেহ বিশ্বাস করিত যে, ঔষধবিশেষের সেবনে আকাশ-গমনাদি সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য ঔষধই, বিশেষতঃ ঔষধে ধাতুর ব্যবহার, আমরা এই রসায়নবিদ্যা হইতে পাইয়াছি। কোন কোন যোগিসম্প্রদায় দাবী করেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান গুরুরা অনেকে এখনও তাঁহাদের পুরাতন শরীরেই বিদ্যমান আছেন। যোগসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণভূত (যাঁহার প্রামাণ্য অকাট্য, সেই) পতঞ্জলিও ইহা অস্বীকার করেন না।

মন্ত্রশক্তিঃ মন্ত্র-নামক কতকগুলি পবিত্র শব্দ আছে; নির্দিষ্ট নিয়মে উচ্চারণ করিলে এগুলি হইতে আশ্চর্য শক্তিলাভ হইয়া থাকে। আমরা দিনরাত অদ্ভুত ঘটনারাশির মধ্যে বাস করি, সেগুলির বিষয়

কিছু চিন্তাও করি না। মানুষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীমা নাই।

তপস্যাঃ তোমরা দেখিবে, প্রত্যেক ধর্মেই তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন আছে। ধর্মের এই দিকটিতে হিন্দুরাই সর্বদা চরম সীমায় গিয়া থাকেন। দেখিবে—এমন অনেকে আছে, যাহারা সারা জীবন ঊর্ধ্বে হাত তুলিয়া রাখে, যে পর্যন্ত না উহা শুকাইয়া অবশ হইয়া যায়। অনেকে দিবারাত্র দাঁড়াইয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের পা ফুলিয়া যায়; যদি তারপরও তাহারা জীবিত থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাহাদের পা এত শক্ত হইয়া যায় যে, তাহারা আর পা মুড়িতে পারে না। বাকী জীবন তাহাদিগকে দাঁড়াইয়াই থাকিতে হয়। আমি একবার এক ঊর্ধ্ববাহু পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যখন প্রথম প্রথম ইহা অভ্যাস করিতেন, তখন কিরূপ বোধ করিতেন?' তিনি বলিলেন, 'প্রথম প্রথম ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হইত। এত যন্ত্রণা হইত যে নদীতে গিয়া জলে ডুব দিয়া থাকিতাম; তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইত। একমাস পরে আর বিশেষ কষ্ট ছিল না।' এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ হইয়া থাকে।

সমাধিঃ মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা, ইহাই প্রকৃত যোগ; এই বিজ্ঞানের ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়; আর ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলি গৌণ। সেগুলির দ্বারা উচ্চতম অবস্থা লাভ

করা যায় না। সমাধিদ্বারাই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাহা কিছু সবই আমরা লাভ করিতে পারি।

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥২॥

প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়া যায়।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবে উপস্থাপিত শক্তিগুলি কখনও জন্ম দ্বারা, কখনও রাসায়নিক ঔষধ দ্বারা অথবা তপস্যা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছা রক্ষা করা যাইতে পারে। এখন তিনি বলিতেছেনঃ এই শরীর একজাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হয় কেন? তাঁহার মতে—ইহা প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা হইয়া থাকে। পরবর্তী সূত্রে তিনি ইহা বুঝাইয়া দিতেছেন।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥৩॥

সৎ ও অসৎ কর্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়, কিন্তু ঐগুলি উহার বাধাভগ্নকারী নিমিত্তমাত্র—যেমন কৃষক জলের গতিপথে বাধা বাঁধ ভাঙিয়া দিলে জল নিজের স্বভাববশেই প্রবাহিত হয়।

যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, শুধু মধ্যে কপাটের দ্বারা ঐ জল রুদ্ধ আছে। কৃষক সেই কপাট খুলিয়া দেয় এবং জল স্বতই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব হইতেই প্রত্যেকের ভিতরে রহিয়াছে। পূর্ণতা মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ভাব; কেবল উহার দ্বারা রুদ্ধ আছে, প্রবাহিত হইবার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ বাধা সরাইয়া দিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শক্তি সবেগে প্রবাহিত হইবে; তখন মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে। এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে এবং প্রকৃতির শক্তি অপ্রতিহত ভাবে ভিতরে প্রবেশ করিলে আমরা যাহাদিগকে দুষ্ট বলি, তাহারা সাধু হইয়া যায়। স্বভাব বা প্রকৃতিই আমাদের পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে, কালে এই প্রকৃতি সকলকেই সেই অবস্থায় লইয়া যাইবে। ধার্মিক হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধমুখ কার্যমাত্র—কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দেওয়া, জন্মগত অধিকারস্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া—পূর্ণতাই আমাদের প্রকৃত স্বভাব।

প্রাচীন যোগীদিগের পরিণামবাদ আধুনিক গবেষণার আলোকে আরও সহজে ও ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে এবং যোগীদের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে অনেক ভাল। আধুনিকেরা বলেন,

পরিণামের দুইটি কারণ—যৌন-নির্বাচন (sexual selection) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন (survival of the fittest)।কিন্তু এই দুইটি কারণ পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এতদূর উন্নত হইল যে, শরীর ধারণ ও সঙ্গী নির্বাচন করিবার প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল। তাহা হইলে আধুনিকদিগের মতে মানুষের উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে এবং জাতির মৃত্যু হইবে। আর এই মতবাদের ফলে প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের বিবেকের ভর্ৎসনা হইতে অব্যাহতি পাইবার একটি যুক্তি লাভ করে। আর এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা নিজেদের দার্শনিক বলিয়া পরিচয় দেন এবং যত দুষ্ট ও অনুপযুক্ত লোকদিগকে মারিয়া ফেলিতে চান (তাঁহারাই যেন মানুষের যোগ্যতা-অযোগ্যতার একমাত্র বিচারক)—এইভাবে তাঁহারা মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিবেন! কিন্তু সেই মহান্ প্রাচীন পরিণামবাদী পতঞ্জলি ঘোষণা করিয়াছেনঃ ক্রমবিকাশ বা পরিণামের প্রকৃত রহস্য—প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে পূর্ণতা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহারই বিকাশ মাত্র; ঐ পূর্ণতা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং বাধার ওপারে অনন্ত তরঙ্গস্রোত নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের অজ্ঞানের ফলমাত্র। এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়া দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে হয়, তাহা জানি না বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। বাঁধের বাহিরে যে অনন্ত তরঙ্গ-স্রোত রহিয়াছে তাহা নিজেকে প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাই

সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ; কেবল জীবন-ধারণের অথবা ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য প্রতিযোগিতা অজ্ঞানজাত ক্ষণিক অনাবশ্যক বাহ্য ব্যাপার মাত্র। সকল প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া গেলেও যতদিন পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমাদের এই অন্তর্নিহিত পূর্ণস্বভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে। অতএব প্রতিযোগিতা যে উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর 'মানুষ' চাপা রহিয়াছে। যেমন দ্বার উন্মুক্ত হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়, অমনি সবেগে 'মানুষ' বহির্গত হয়; এইরূপে মানুষের ভিতরও দেবতা অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গলে ও শৃঙ্খলে তিনি বন্দী হইয়া আছেন। যখন জ্ঞান এই অর্গলগুলি ভাঙিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবতা প্রকাশিত হন।

নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥৪॥

যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই অনেক চিত্ত সৃজন করিতে পারেন।

কর্মবাদের তাৎপর্য এই যে, আমরা আমাদিগের সদসৎ কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি, আর সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য—মানুষের নিজ মহিমা অবগত হওয়া। সকল শাস্ত্রেই মানবের আত্মার মহিমা ঘোষণা করিতেছে; আবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মবাদ প্রচার

করিতেছেঃ শুভ কর্মের ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি শুভাশুভ কর্ম আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে আত্মা তো কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে অশুভ কর্ম কেবল পুরুষের স্বরূপ প্রকাশে বাধা দেয়; শুভ কর্ম সেই বাধাগুলি দূর করিয়া দেয়; তখনই পুরুষের মহিমা প্রকাশিত হয়, কিন্তু পুরুষ নিজে কখনই পরিবর্তিত বা পরিণামপ্রাপ্ত হন না। তুমি যাহাই কর না কেন, কিছুই তোমার মহিমা—তোমার নিজ স্বরূপ নষ্ট করিতে পারে না; কারণ কোন বস্তুই আত্মার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, আত্মার উপর কেবল একটি আবরণ পড়ে এবং উহার পূর্ণতা আচ্ছাদিত হয়।

যোগিগণ শীঘ্র শীঘ্র কর্মক্ষয় করিবার জন্য 'কায়ব্যূহ' অর্থাৎ একসঙ্গে বহু দেহ সৃজন করেন। এই-সকল দেহের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের অস্মিতা বা অহংতত্ত্ব হইতে অনেকগুলি মন সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের মূল চিত্তের সহিত পৃথকত্ব বুঝাইবার জন্য এই নির্মিত চিত্তসমূহকে 'নির্মাণচিত্ত' বলা হয়।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥৫॥

যদিও এই ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি মনের কার্য নানাপ্রকার, কিন্তু সেই এক আদি মনই সবগুলির নিয়ন্তা।

ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য করে, এগুলিকে ‘নির্মাণচিত্ত’ এবং এই শরীরগুলিকে ‘নির্মাণদেহ’ বলে; অর্থাৎ বিশেষভাবে নির্মিত শরীর ও মন। ভূত (মূল উপাদান) ও মন যেন দুইটি অফুরন্ত ভাণ্ডারগৃহের মত। যোগী হইলেই তুমি এ-দুটিকে জয় করিবার রহস্য অবগত হইবে। এই জ্ঞান বরাবরই তোমার ছিল, তুমি শুধু উহা ভুলিয়া গিয়াছ। যোগী হইলে উহা তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে, তখন তুমি উহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে। যে উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নির্মাণচিত্তই সেই উপাদান হইতে নির্মিত। মন এক পদার্থ আর ভূত এক পৃথক্ পদার্থ, তাহা নয়; উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন দিক মাত্র। অস্মিতাই সেই উপাদান, সেই সূক্ষ্ম বস্তু, যাহা হইতে যোগীর এই নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণদেহ প্রস্তুত হয়। সুতরাং যখনই যোগী প্রকৃতির এই শক্তিগুলির রহস্য অবগত হন, তখনই তিনি অস্মিতা-নামক উপাদান হইতে যত ইচ্ছা মন ও শরীর নির্মাণ করিতে পারেন।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥৬॥

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে-চিত্ত সমাধি দ্বারা লব্ধ, তাহা বাসনাশূন্য।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মন দেখিতে পাই, তন্মধ্যে যে মনের পূর্ণ একাগ্রতা বা সমাধি-অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহাই সর্বোচ্চ। যে ব্যক্তি ঔষধ, মন্ত্র অথবা কৃচ্ছ্রতাবলে কতকগুলি শক্তি লাভ করে, তাহার তখনও বাসনা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধ্যানযোগের দ্বারা সমাধি লাভ করে, কেবল সেই ব্যক্তিই সকল বাসনা হইতে মুক্ত।

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥৭॥

যোগীদের কর্ম কৃষ্ণও নয়, শুক্লও নয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ—অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র।

যখন যোগী সিদ্ধি বা পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাঁহার কার্য ও ঐ কার্য দ্বারা যে-সব কর্মফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না; কারণ তিনি তো ঐগুলি চান নাই। তিনি কেবল কর্ম করিয়া যান। তিনি পরহিতের জন্য কর্ম করেন, কল্যাণ-কর্ম করেন, কিন্তু ফলের দিকে তাকান না, অতএব কর্মফল তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা আলদা; যাহারা এই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ—কৃষ্ণ (অসৎ বা অশুভ কর্ম), শুক্ল (সৎ বা শুভ কর্ম) ও মিশ্র।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥৮॥

এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যেগুলি সেই অবস্থায় প্রকাশ পাইবার উপযুক্ত। (অন্যগুলি সেই সময়ের জন্য স্তিমিতভাবে থাকে।)

মনে কর, আমি সৎ, অসৎ, ও মিশ্রিত—এই তিন প্রকার কর্মই করিলাম; তারপর মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি স্বর্গে দেবতা হইলাম। মনুষ্যদেহের বাসনা আর দেবদেহের বাসনা একরূপ নয়। দেবশরীর ভোজন বা পান কিছুই করে না। তাহা হইলে আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত কর্ম আহার ও পানের বাসনা সৃজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে? আমি যদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই কর্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, বাসনা উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশিত হইতে পারে। যে-সকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ হইয়াছে, কেবল সেগুলিই প্রকাশ পাইবে; অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। এই জীবনেই আমাদের অনেক দেবোচিত, অনেক মনুষ্যোচিত ও অনেক পাশব বাসনা রহিয়াছে। আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসনাগুলি ফলোন্মুখ হইবে, কারণ ঐগুলি প্রকাশের জন্য পরিবেশ উপযুক্ত হইয়াছে। আমি যদি পশু দেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল পাশব বাসনাগুলিই আগাইয়া আসিবে। শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ইহাতে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় যে, উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্যে এই বাসনাগুলি আমরা দমন করিতে পারি। কেবল যে কর্ম সেই

বিশেষ পরিবেশের উপযোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পরিবেশের শক্তিতে কর্মকেও নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯॥

স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কাল ব্যবহিত হইলেও বাসনার আনন্তর্য হইবে।

অনুভূতিসমূহ সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে পরিণত হয়, জাগরিত সংস্কারকেই 'স্মৃতি' বলে। বর্তমানে জ্ঞাতসারে কৃত কর্মের সহিত সংস্কাররূপে পরিণত পূর্বানুভূতিসমূহের মনের অগোচরে যে সমন্বয় হয়, তাহাও এই স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক দেহে, তজ্জাতীয় দেহে যে-সকল সংস্কার লব্ধ হইয়াছে, কেবল সেগুলি সেই দেহে কর্মের কারণ হইবে। ভিন্ন জাতীয় দেহের সংস্কার তখন স্তিমিতভাবে থাকিবে। প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় কতকগুলি শরীরের উত্তর-পুরুষরূপে কার্য করিবে। এইরূপে বাসনার পৌর্বাপর্য নষ্ট হয় না।

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥১০॥

সুখের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও অনাদি।

আমাদের সকল ভোগ ও অভিজ্ঞতা সুখী হইবার বাসনা হইতেই উৎপন্ন। এই ভোগের কোন আদি নাই; কারণ প্রত্যেক নূতন ভোগই পূর্বভোগের দ্বারা আমাদের চিত্তে যে এক প্রকার প্রবণতা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই উপর স্থাপিত। এই কারণে বাসনা অনাদি।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥১১॥

এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও তাহার বিষয়—এইগুলি দ্বারা একত্র গ্রথিত বলিয়া ইহাদের অভাব হইলে বাসনারও অভাব হয়।

এই বাসনাগুলি কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত; মনে কোন বাসনা উদিত হইলে উহা স্বীয় ফলপ্রসব না করিয়া বিনষ্ট হইবে না। আবার মন সংস্কাররূপে পরিণত অতীত বাসনাসমূহের আধার—বৃহৎ ভাণ্ডারস্বরূপ; যতক্ষণ না ঐগুলি কর্মরূপে নিঃশেষিত হইতেছে, ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই। আবার যতদিন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তু গ্রহণ করিবে, ততদিন নূতন নূতন বাসনা উত্থিত হইবে। যদি এইগুলি (কার্য, কারণ, আধার ও বিষয়) হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, তবেই বাসনার বিনাশ হইতে পারে।

অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্ ॥১২॥

বস্তুর ধর্ম (বা গুণ) সকলই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ (বর্তমানে দৃষ্টি না হইলেও) তাহাদের স্বরূপেই অবস্থিত আছে।

তাৎপর্য এই যে, অসৎ (অনস্তিত্ব) হইতে কখনও সৎ (অস্তিত্ব) উৎপন্ন হয় না। অতীত ও ভবিষ্যৎ যদিও ব্যক্তরূপে এখন নাই, তথাপি সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান আছে।

তে ব্যক্তসূক্ষ্ম গুণাত্মানঃ ॥১৩॥

উহারা কখনও ব্যক্ত, কখনও বা সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করে, আর গুণই উহাদের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ।

গুণ বলিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন উপাদানকে বুঝায়, উহাদের স্থূল অবস্থাই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। অতীত ও ভবিষ্যৎ এই গুণ কয়েকটিরই বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হয়।

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥১৪॥

পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়া বস্তু বাস্তবিক এক।

যদিও উপাদান তিনটি—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, তথাপি তাহাদের পরিণাম ও পরিবর্তনের ভিতরে একটি সম্বন্ধ থাকায় সকল বস্তুতেই একত্ব আছে, বুঝিতে হইবে।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥১৫॥

বস্তু এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসনা ও অনুভূতি হইয়া থাকে। একই বস্তু সম্পর্কে যেহেতু অনুভূতি ও বাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয়, অতএব মন ও বিষয় ভিন্নস্বভাব।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥১৬॥

চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্বপাতের অপেক্ষা থাকাতে বস্তু কখনও জ্ঞাত ও কখনও অজ্ঞাত থাকে।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাহপরিণামিত্বাৎ ॥১৭॥

চিত্তবৃত্তিগুলিকে সর্বদাই জানা যায়, কারণ উহাদের প্রভু পুরুষ অপরিণামী।

এতক্ষণ ধরিয়া যে মতের কথা বলা হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, জগৎ মনোময় ও ভৌতিক—এই উভয় প্রকারই। আর এই মনোময় ও ভৌতিক জগৎ সর্বদাই যেন প্রবাহের আকার চলিয়াছে। এই পুস্তকখানি কি? ইহা নিত্যপরিবর্তনশীল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। কতকগুলি বাহিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আসিতেছে, উহা একটি আবর্তস্বরূপ। কিন্তু এই একত্ববোধ কি করিয়া হইতেছে? এটি যে সেই একই পুস্তক, এই বোধ কি করিয়া হইতেছে? এই পরিণামগুলি তালে তালে হইতেছে; তালে

তালে উহারা আমার মনে তাহাদের প্রভাব প্রেরণ করিতেছে। যদিও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সদা পরিবর্তনশীল, তথাপি উহারাই একত্র হইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন চিত্রের জ্ঞান উৎপন্ন করিতেছে। মনও এইরূপ সদা পরিবর্তনশীল। মন আর শরীর যেন বিভিন্ন গতিশীল একই পদার্থের দুইটি স্তর মাত্র। তুলনায় একটি মৃদু ও অপরটি দ্রুততর বলিয়া অবশ্য আমরা ঐ দুইটি গতির মধ্যে পার্থক্য অনায়াসে ধরিতে পারি। যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে এবং একখানি গাড়ী তাহার পাশ দিয়া যাইতেছে। কিছুদূর পর্যন্ত এই উভয়েরই গতি নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি আর একটি পদার্থের প্রয়োজন। নিশ্চল বস্তু একটি থাকিলেই গতিকে অনুভব করা যাইতে পারে। তবে যখন দুই-তিনটি বস্তু বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট হয়, তখন আমরা প্রথমে দ্রুততরটির, পরিশেষে মৃদুতর গতিশীল বস্তুটির গতি অনুভব করিতে পারি। মন কি করিয়া অনুভব করিবে? উহাও নিয়ত গতিশীল। সুতরাং অপর একটি বস্তু থাকা প্রয়োজন, যাহা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে গতিশীল; পরে তদপেক্ষা মৃদুতর, তদপেক্ষা মৃদুতর এইরূপ চলিতে চলিতে ইহার আর সীমা পাওয়া যাইবে না। সুতরাং যুক্তি তোমাকে কোন একস্থানে থামিতে বাধ্য করিবে। অপরিবর্তনীয় কোন বস্তুকে জানিয়া তোমাকে এই পর্যায়ের শেষ করিতেই হইবে। এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অসঙ্গ, শুদ্ধস্বরূপ পুরুষ রহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লণ্ঠন হইতে

আলোক আসিয়া স্থির বস্ত্রখণ্ডের উপর প্রতিফলিত হইয়া উহাতে নানা বর্ণের চিত্র উৎপন্ন করে, অথচ কোনরূপেই উহাকে মলিন বা রঞ্জিত করে না, ঠিক সেইভাবেই এই-সব সংস্কার স্থির পুরুষের উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥১৮॥

মন দৃশ্য (পদার্থ) বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ নয়।

প্রকৃতির সর্বত্রই প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতি স্বপ্রকাশ নয়, স্বভাবতঃ চৈতন্যস্বরূপ নয়। কেবল পুরুষই স্বপ্রকাশ, তাঁহার জ্যোতিতেই প্রত্যেক বস্তু উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহারই শক্তি জড় ও অন্যান্য শক্তির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতেছে।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥১৯॥

এক সময়ে দুইটি বস্তুকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ নয়।

মন যদি স্বপ্রকাশ হইত, তবে একই সময়ে উহা নিজেকে ও উহার প্রকাশ্য বস্তুগুলিকে অনুভব করিতে পারিত; মন তো তাহা পারে না। যদি এক বস্তুতে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর অন্য বস্তুতে মন এক সময়ে নিজেকে ও বিষয়কে অনুভব করিতে পারে না বলিয়া উহা স্বপ্রকাশ নয়, পুরুষই স্বপ্রকাশ।

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥২০॥

যদি কল্পনা করা যায় যে, আর এক চিত্ত ঐ চিত্তকে প্রকাশ করে, তবে এইরূপ কল্পনার অন্ত থাকিবে না এবং স্মৃতির গোলমাল হইয়া যাইবে।

মনে কর—আর একটি মন রহিয়াছে, উহা এই সাধারণ মনটিকে অনুভব করিতেছে, তাহা হইলে আবার এমন একটি মনের আবশ্যক,যাহা আবার ঐ মনটিকে অনুভব করিবে, সুতরাং কোথাও ইহার শেষ পাওয়া যাইবে না। ইহাতে স্মৃতিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ স্মৃতির কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার থাকিবে না।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্ ॥২১॥

চিতি (পুরুষের শক্তি) অপরিণামী (পরিবর্তিত হয় না, অপরের দিকে সঞ্চারিত হয় না); যখন মন চিতিশক্তির আকার গ্রহণ করে, তখনই উহা জ্ঞানময় হয়।

জ্ঞান যে পুরুষের গুণ নয়, ইহা স্পষ্টতর ভাবে বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি এই কথা বলিলেন। মন যখন পুরুষের নিকট আসে, তখন যেন পুরুষ মনের উপর প্রতিফলিত হন আর মন সাময়িকভাবে জ্ঞানবান্ হয়, আর বোধ হয় যেন মনই পুরুষ।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্ ॥২২॥

মন যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত (রঞ্জিত) হয়, তখন উহা সর্বপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে।

একদিকে দৃশ্য অর্থাৎ বাহ্য জগৎ মনের উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছে, অপর দিকে দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ উহার উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছেন; এইভাবেই মনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আসে।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥২৩॥

সেই মন অসংখ্য বাসনাদ্বারা চিত্রিত হইলেও সংহত পদার্থ বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য কার্য করে।

মন নানাপ্রকার পদার্থের সংহতি; সুতরাং উহা নিজের জন্য কার্য করিতে পারে না। এই জগতে যত সংহত পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন অপর বস্তুতে—এমন কোন তৃতীয় বস্তুতে—যাহার জন্য সেই পদার্থ এইরূপে সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং নানাপ্রকার বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন মনও পুরুষের জন্য।

বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা -বিনিবৃত্তিঃ ॥২৪॥

বিশেষদর্শী অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের পক্ষে মনে আত্মভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়।

বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নন।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রা গ্‌ভাবংচিত্তম্ ॥২৫॥

তখন চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যের পূর্বাবস্থা লাভ করে।

এইরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা বিবেকশক্তিরূপ দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ হইয়া থাকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ সরিয়া যায়, আমরা তখন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, উহা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের জন্য এই-সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে। আমরা তখন বুঝিতে পারি, প্রকৃতি জগতের প্রভু নয়। এই প্রকৃতির সমুদয় সংহতি কেবল আমাদের হৃদয়সিংহাসনে সমাসীন রাজা পুরুষকে এই-সব দৃশ্য দেখাইবার জন্য। যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা বিবেকর উদয় হয়, ভয় চলিয়া যায় ও কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥২৬॥

উহার বিঘ্নরূপে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য চিন্তা মনে উঠে, তাহা সংস্কার হইতেই উৎপন্ন হয়।

আমাকে সুখী করিবার জন্য কোন বাহিরের বস্তু আবশ্যক—এইরূপ বিশ্বাস আমাদের যে-সকল ভাব হইতে আসে, সেগুলি সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক। পুরুষ স্বভাবতঃ সুখ ও আনন্দ-স্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞান

পূর্বসংস্কারের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হওয়া আবশ্যক।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥২৭॥

(অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি) ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা ধ্বংস করার কথা বলা হইয়াছে (২।১০), এগুলিকেও ঠিক সেই উপায়েই নাশ করিতে হইবে।

প্রসংখ্যানে হপ্যকুসীদস্য সর্বথাবিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৮॥

তত্ত্বসমূহের বিবেকজ্ঞানলাভের ঠিক পূর্বে ঐশ্বর্যরূপ ফলও যিনি ত্যাগ করেন, বিবেকজ্ঞানের ফলে তাঁহার ধর্মমেঘ-নামক সমাধি লাভ হইয়া থাকে।

যখন যোগী এই বিবেকজ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার নিকট পূর্ব অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আসিবে, কিন্তু প্রকৃত যোগী এগুলি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তখন তিনি এক বিশেষ আলোক দেখিতে পান—তিনি ধর্মমেঘ-নামক এক আশ্চর্য জ্ঞানের অধিকারী হন। ইতিহাস যে-সকল ধর্মগুরুর কথা বর্ণনা করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই ধর্মমেঘ-সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের ভিতরেই জ্ঞানের বিশাল ভিত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

সত্য তাঁহাদের নিকট বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত শক্তিসমূহের অভিমান ত্যাগ করাতে শান্তি, বিনয় ও পূর্ণ পবিত্রতা তাঁহাদের স্বভাবগত হইয়া গিয়াছিল।

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥২৯॥

তাহা হইতে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়।

যখন এই ধর্মমেঘ-সমাধি হয়, তখন আর পতনের আশঙ্কা নাই, কিছুতেই আর তাঁহাকে নিম্নদিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না, আর তাঁহার কোন দুঃখকষ্ট থাকে না।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥৩০॥

তখন সর্বপ্রকার আবরণ ও অশুদ্ধি-শূন্য হওয়ায় জ্ঞান অনন্ত হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞেয়ও অল্প হইয়া পড়ে।

জ্ঞান তো ভিতরেই রহিয়াছে, উহার আবরণ সরিয়া গিয়াছে। কোন বৌদ্ধশাস্ত্র 'বুদ্ধ' (ইহা একটি সূচক) শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন— অনন্ত আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান। যীশু ঐ অবস্থা লাভ করিয়া 'খ্রীষ্ট' হইয়াছিলেন। তোমরা সকলেই ঐ অবস্থা লাভ করিবে। তখন জ্ঞান অনন্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়া যাইবে। সর্বপ্রকার জ্ঞেয়বস্তু-সমন্বিত সমগ্র জগৎ পুরুষের নিকট যেন শূন্যে

পরিণত হয়। সাধারণ মানুষ নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করে, কারণ তাহার নিকট জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত বলিয়া বোধ হয়।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥৩১॥

যখন গুণগুলির কার্য শেষ হইয়া যায়, তখন গুণগুলির পর পর যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম তাহাও শেষ হইয়া যায়।

তখন গুণগুলির এই-সব বিবিধ পরিণাম—এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণতি—সব একেবারে শেষ হইয়া যায়।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ॥৩২॥

যে পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহূর্তসম্বন্ধ লইয়া অবস্থিত ও যাহাকে একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে (শেষে) যাইয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম ক্রম।

পতঞ্জলি এখানে 'ক্রম'-শব্দের সংজ্ঞা দিতেছেন। যে পরিণামগুলি মুহূর্তকালসম্বন্ধে সম্বন্ধ, 'ক্রম' শব্দ দ্বারা সেগুলিকে বুঝাইতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি, ইহারই মধ্যে কতক মুহূর্ত চলিয়া গেল। এই প্রতি মুহূর্তেই ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু আমরা ঐ পরিণামগুলিকে একটি শ্রেণীর অন্তে (অর্থাৎ অনেক পরিণামশ্রেণীর পর) ধরিতে পারি। ইহাকে 'ক্রম' বলে। কিন্তু যে-মন সর্বব্যাপী হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে আর 'ক্রম' নাই। তাহার পক্ষে সবই

বর্তমান হইয়া গিয়াছে। কেবল এই বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তখন সেই মন কালকে জয় করে, আর সমুদয় জ্ঞানই তাহার নিকট মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। সবই তাহার নিকট বিদ্যুতের মত এক ঝলকে প্রকাশ পায়।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি ॥৩৩॥

গুণসকলে যখন পুরুষের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে ‘কৈবল্য’ বলে, অথবা উহাকে চিৎশক্তির (চৈতন্যশক্তির) স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়।

প্রকৃতির কার্য ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কার্য নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আত্মবিস্মৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি—বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ হারানো মহিমা ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই

পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহারা এই পদচিহ্নহীন জীবনের মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে তিনি অনাদি অনন্ত কাল কার্য করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে সুখদুঃখের মধ্য দিয়া, ভালমন্দের মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণ অনন্ত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন।

যাঁহারা নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের জয় হউক! তাঁহারা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

—

Table of Contents